চাঁদমামা
জানুয়ারী ১৯৭৪
৭০
P

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com
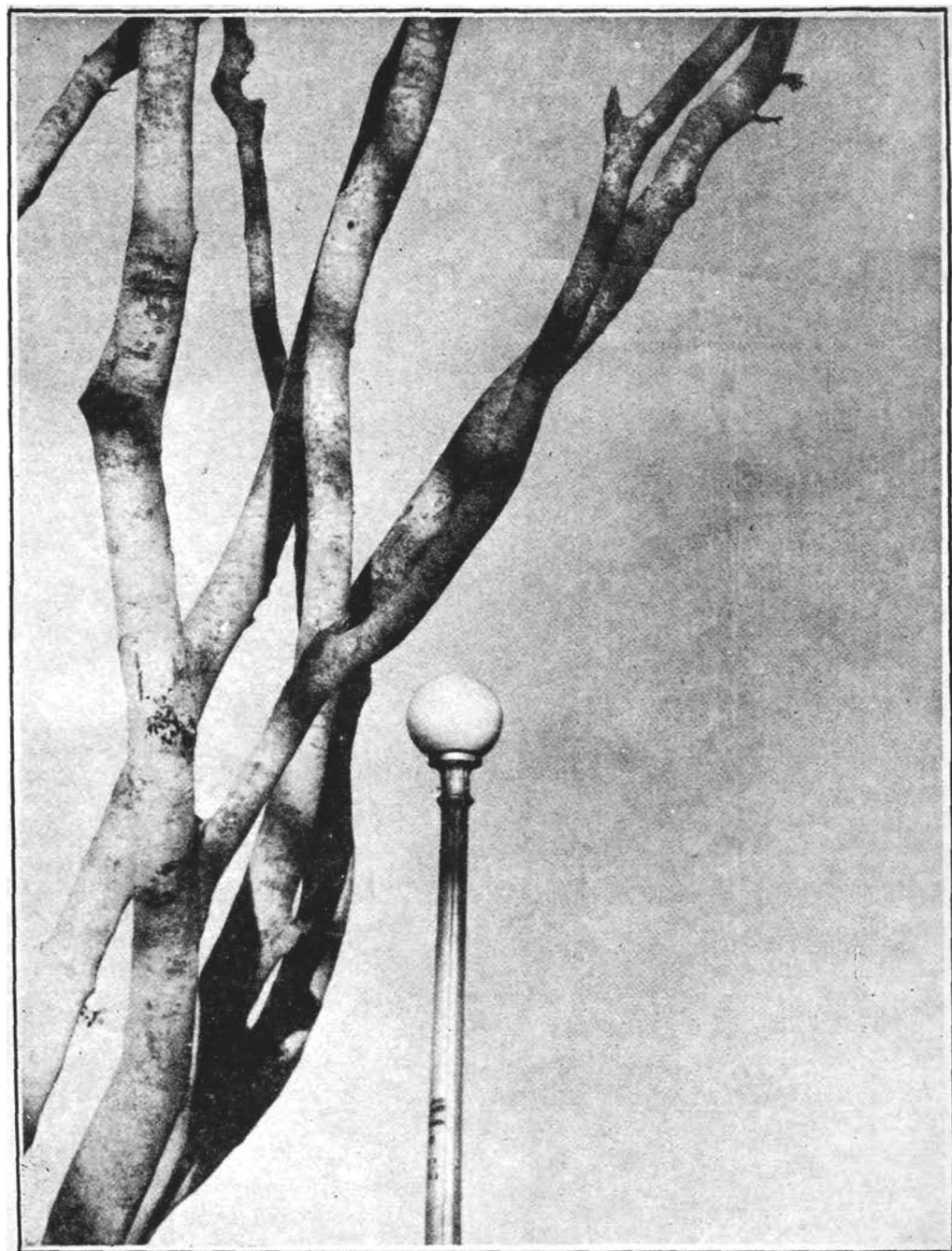
Photo by: **C. K. SATYARAJ**

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁত উঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ থেকে 'চাঁদমামা'র দাম হবে এক টাকা

প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। কাগজের দাম সীমা ছাড়িয়ে বেড়েই চলেছে। এভাবে কত যে বাড়বে তা কল্পনাও করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায়ও আমরা 'চাঁদমামা'র দাম না বাড়িয়ে অনেক দিন চালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন, এই সংকটজনক অবস্থায় আমরা আপনাদের দ্বারস্থ। মাত্র দশটি পয়সা বেশি চাইছি। আগামী ফেব্রুয়ারী '৭৪ এর সংখ্যা থেকে মাত্র দশ পয়সা বাড়িয়ে 'চাঁদমামা'র দাম রাখা হচ্ছে এক টাকা। এই পরিবর্তন, আশা করি আমাদের পাঠক, হিতৈষী ও এজেন্টগণ সানন্দে মেনে নেবেন ও আগের মতই তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করবেন।

—প্রকাশক
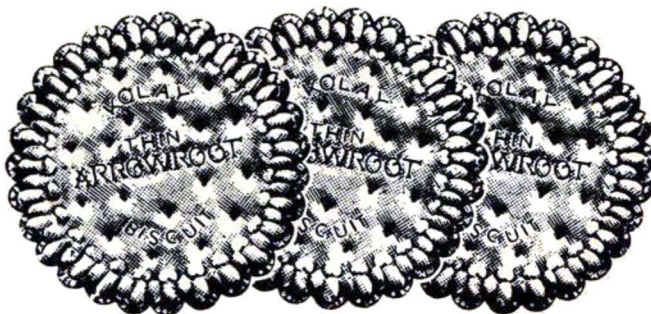
আমাদের
সবার ভাল লাগে
চাঁদমামা
তোমারও লাগবে
ছোট বড় সবাই চাঁদমামা ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী,
গুজরাতী, তেলুগু, কন্নড, তামিল, মালয়ালম্
আর ইংরেজী মোট দশটি ভাষায়।
মন ভুলানো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।
চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড়, কত বড় হবে ছোট।
আজকেই চাঁদমামা কেনো।
চাঁদমামা

everest/547/PP ben

চাঁদমামা
সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি
এমাসের বেতাল কথায় কথা রাখার সমস্যা নিয়ে লেখা কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কোন পদে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা একটি সমস্যা। এই কাহিনীতে রাজা নিজের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে বাছাই করলেন চতুর্থ রাজকুমারকে। অথচ এই চতুর্থ রাজকুমার রাজার কথা-মত চলত না। তিনি যে কাজের ভার দিতেন সে ঐ কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিত। কাহিনী পড়ে মনে হয় রাজা যোগ্য পাত্রকেই বাছাই করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া আরও গল্প আছে।
খণ্ড ২ জানুয়ারী ১৯৭৪ সংখ্যা ৭
CP
CHITRA

অমর বাণী

ধন্যাস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠা যে বুদ্ধ্যা কোপমুদ্দিতম্
নিরুন্দতি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নি সিবাম্ভসা। ॥ ১ ॥

[জ্বলন্ত বস্তুতে জল ঢেলে যেমন আগুন নেভানো যায় তেমনি ক্রোধের উপর যিনি নিয়ন্ত্রণ রাখেন তিনিই পুরুষশ্রেষ্ঠ।]

ক্রুদ্ধঃ পাপম্ ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধোহন্যাৎ গুরুনপি
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরসাধু নধিক্ষিপেৎ। ॥ ২ ॥

[রাগের মাথায় পাপ কাজ করে ফেলে না এমন লোক কে আছেন? রাগী লোক গুরুকেও বধ করে বসে। রাগী লোক সজ্জনকেও খারাপ কথা বলে ফেলে।]

বাচ্যাবাচ্যম্ প্রকুপিতো ন বিজানাতিকর্হিচিৎ
না কার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য, না বাচ্যম্ বিদ্যতে ক্বচিৎ। ॥ ৩ ॥

[যার খুব রাগ হয়, তার সেই রাগের মাথায় কোন্ কথা বলা উচিত আর কোন্ কথা বলা উচিত নয় সেই জ্ঞান থাকে না। কোন্ কাজ করা উচিত আর কোন্ কাজ করা উচিত নয় সেই জ্ঞানও তার থাকে না।]

য স্সমুৎপতিতম্ ক্রোধম ক্ষময়ৈব নিরস্যতি
য থোরগস্ত্বচম্ জীর্ণাম্ স বৈ পুরুষ উচ্চতে। ॥ ৪ ॥

[সাপ যেমন নিজের শিথিল চামড়া বা খোলসকে পরিত্যাগ করে তেমনি সত্যিকারের পুরুষ নিজের ক্রোধকে সহনশীলতার মাধ্যমে ত্যাগ করে।]

ক্রোধ

যক্ষপর্বত

আঠার

[সমরবাহুর লোক বীরপুরের সেনাদের পরাজিত করল। তাদের পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ ও সিংহদের নিয়ে সমরবাহুর লোক বনবাসীদের সাহায্যে স্বর্ণাচারির কাছে এল। সমরবাহুর লোকের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে চিড়িয়াখানার অধিকারী ও শিকারী বীরপুরে পালিয়ে এল। তারপর···]

বীরপুর রাজার পশুপালকদের অধিকারী একজন অনুচরকে নিয়ে সারা পথ ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে হুশিয়ারী দিতে দিতে রাজধানীর দিকে এগোতে লাগল। ওদের ভয়ার্ত চিৎকার রাজা বীরসিংহ ও তাঁর মন্ত্রীর কানে গেল। রাজা ও মন্ত্রী তখন রাজপ্রাসাদে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

রাজা বীরসিংহ তাঁর নিজের লোকের গলা শুনে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নিচে পথের দিকে তাকালেন। মন্ত্রীকে ডেকে পশুপাখিদের রক্ষাকারীকে দেখালেন। এই দৃশ্য দেখে রাজা বীরসিংহ মন্ত্রীকে বললেন, "কি ব্যাপার মহামন্ত্রী ? চিড়িয়াখানার অধিকারী এভাবে একজনকে সঙ্গে নিয়ে পাগলের মত চিৎকার করছে কেন ? কি
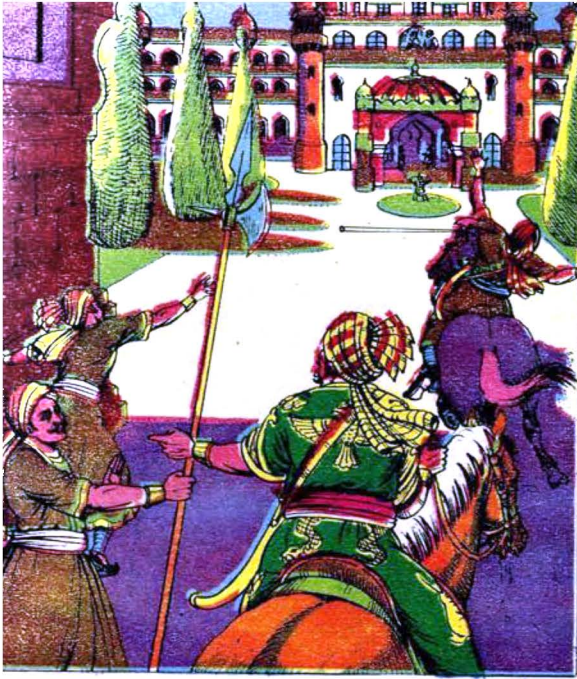
বলছে সে ? এত জোরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে যেন তাকে বাঘে তাড়া করেছে। শত্রুরা যেন তাকে তাড়া করছে! কি ব্যাপার! কি হল!"

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী নিচের দিকে ঝুঁকে তাকাল মন্ত্রী দেখতে পেল শুধু চিড়িয়াখানার অধিকারী ও তার সঙ্গীই ছুটছে না তাদের অবস্থা দেখে অনেক পথচারিও ছোটাছুটি করছে। তখন মন্ত্রী দুর্গের দ্বারপালকে আসল ঘটনা যে কি তা জানার জন্য পাঠাল। ঠিক তখনই চিড়িয়াখানার অধিকারী ও সঙ্গী সেনাটি রাজপ্রাসাদের দ্বারে পৌঁছে গেল। ওরা ঘোড়া থেকে নেমে ভিতরে যেতে চাইল।

প্রাসাদের দ্বারে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে কি যেন বলতে গেল এমন সময় চিড়িয়াখানার অধিকারী তাকে ধমক দিয়ে বলল, "কি বলতে চাইছ তুমি ? এখন কি আজেবাজে কথা বলার সময় আছে ? বাইরের শত্রু দেশের ভিতরে ঢুকে পড়েছে আর এরকম একটা চরম সঙ্কটের সময় তুমি আজেবাজে প্রশ্ন করছ! সর সামনে থেকে!"

"দেশ বিপন্ন! দেশ আক্রান্ত!" বলে চিৎকার করতে করতে চিড়িয়াখানার অধি-কারীর সঙ্গে যে সেনা ছিল সে কথার মাঝেই এগিয়ে গেল। ঢুকে গেল প্রাসাদে। মুহূর্তে তার পিঠে বিদ্ধ হল প্রাসাদের দ্বারে দণ্ডায়মান প্রহরীর বল্লম। সেনাটি, "মহারাজ বীরসিংহের জয় হোক!" বলে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রাসাদের উপর থেকে এই দৃশ্য দেখে রাজা খুশী হয়ে মন্ত্রীকে বললেন, "দেখলে তো মন্ত্রী, আমার সেনাদের রাজভক্তি কত গভীর। এই ধরণের রাজভক্ত সেনা-দের নিয়ে আমি ইচ্ছে করলে অনেক রাজ্য জয় করতে পারি।"

রাজার কথা মন্ত্রীর মনে ধরল না। মন্ত্রী চিড়িয়াখানার অধিকারীর কথা শুনেছিল। সে যে ভীষণভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় ছোটাছুটি করছিল তাও তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

মন্ত্রী হাত তুলে পাহারাদারকে ডেকে বললেন, "ওহে, এক কাজ কর। ওকে ঘোড়াসহ অথবা ঘোড়া ছাড়া নিয়ে এস।"

মন্ত্রীর আদেশে মুহূর্তে চিড়িয়াখানার অধিকারী মহলের ভিতরে ঢুকে গেল। আহত সেনাটিও গেল মহলের ভিতরে।

সেখান থেকে তাদের দুজনকে মহলের উপরে মন্ত্রী ও রাজার কাছে নিয়ে গেল মহলের পাহারাদার সেনারা। মন্ত্রী তাদের গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা দুজনে অনেক পুরোনো রাজকর্মচারি, তোমরা কি জান না প্রাসাদের সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে ঢোকা নিষেধ? এই সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি কি তোমাদের লোপ পেয়েছিল?"

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে চিড়িয়াখানার অধিকারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "মহা-মন্ত্রী, ক্ষমা করবেন। দেশ আক্রান্ত হওয়ায় সাধারণ নিয়মকানুনের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। উদ্বেগের ফলে জ্ঞান বুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য লোপ পেয়েছিল।"

ওর কথা শুনে রাজা বীরসিংহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বীরপুর রাজ্যের উপর আক্রমণ করতে আসছে? কারা? কখন? রাজা বীরসিংহ অধিকারীকে প্রশ্ন করতে যাবেন এমন সময় মন্ত্রী গর্জে উঠে বলল, "কি বললে? দেশ আক্রান্ত হয়েছে? কে আক্রমণ করেছে? কারা আসছে আমাদের দেশে? তুমি জানলে কি করে? দেশে

আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা প্রবল পরাক্রমে তাদের পরাস্ত করেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই উটে চড়ে আরও কয়েক-জন লোক এসে আমাদের উপর আক্রমণ করল। আমরা বীরত্বের সঙ্গে তাদেরও মোকাবিলা করলাম। কিন্তু এইবার আমা-দের কয়েকজন ওদের প্রচণ্ড আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে আহত হল। আমাদের দু-একজন সেনা মারাও গেল। অবশ্য ওদের লোকও মারা গেছে। এরকম অবস্থায় আমি এই সেনাটিকে নিয়ে খবর দিতে জীবন মুঠোয় করে এসেছি।"

ওর কথা শুনে রাজা ও মন্ত্রী ভয় পেলেন। তাঁদের মনে হল কোন এক প্রবল প্রতাপান্বিত পরাক্রমশালী রাজা বহু সেনা নিয়ে যে কোন মুহূর্তে তাঁদের রাজধানী আক্রমণ করতে পারে। যে কোন মুহূর্তে তাঁরা শত্রুর কবলে পড়তে পারে।

রাজা ও মন্ত্রী দুজনের কেউই মুখ খোলেন না। সব চুপচাপ। তাঁদের মুখে কথা সরছে না। অনেকক্ষণ পরে রাজা থেমে থেমে বললেন, "আমাদের চিড়িয়া-খানার অধিকারীর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের উত্তরপ্রান্তে প্রবল শক্তি-শালী কোন রাজা এসে গেছে। শত্রুর কবলে হয়ত আমাদের উত্তর প্রান্ত আক্রান্ত। অবিলম্বে শত্রুর মোকাবিলা

কেউ পা রাখলে সীমান্ত সেনার কাছ থেকে প্রথমেই সেনাপতি খবর পেয়ে যায়। সেনাপতির আগে তোমাকে কে খবর দিয়েছে? তুমি থাক নগরে, পশুপাখিদের দেখাশোনার ভার তোমার। তোমার দৌড় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। তুমি সীমান্তের খবর জানলে কি করে? তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।"

চিড়িয়াখানার অধিকারী আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "মহামন্ত্রী ক্ষমা করবেন। আমি চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের রাজ্যের উত্তর প্রান্তের বনে গিয়েছিলাম সেখানে সমর-বাহু নামে এক রাজার সেনারা হঠাৎ

করতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি সেনা-পতিকে ডেকে পাঠান।"

মন্ত্রী সেনাপতিকে ডেকে পাঠানোর জন্য লোক পাঠিয়ে চিড়িয়াখানার অধি-কারীর আপাদ মস্তকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কাজ হল পশুপাখিদের ধরা, তাদের লালন পালন করা। তাইতো? কিন্তু উত্তর প্রান্তে তোমরা যেভাবে যুদ্ধ করেছ বলছ তাতে মনে হচ্ছে তোমরা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলে। তোমরা কি কোন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছিলে?"

"মহামন্ত্রী, আমাকে বাঘ সিংহ ধরতে গিয়ে অনেক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ঐ হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে এক রকম যুদ্ধ করেই জয়ী হতে হয়। কাজেই প্রস্তুতি আমাদের থাকেই। প্রাণের দায়েই রাখতে হয়। তাই এই প্রস্তুতি নিয়ে হঠাৎ আক্রান্ত হলে আমরা শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ না করে কি বা করতে পারি। শত্রুকে আক্রমণ না করার অর্থই তো মৃত্যু।" চিড়িয়াখানার অধিকারী বলল।

তার কথা শুনে মন্ত্রীর মন থেকে যেন সন্দেহের মেঘ কাটল না। মন্ত্রী তাকে কাছে ডেকে একবার ঘুরে দাঁড়াতে বলল। অধিকারী মন্ত্রীর নির্দেশমত ঘোরার সময় মন্ত্রী দেখছিল তার গায়ে বা কাপড়ে তরবারির আঘাতের কোন চিহ্ন আছে কি না। কিন্তু তা ছিল না।
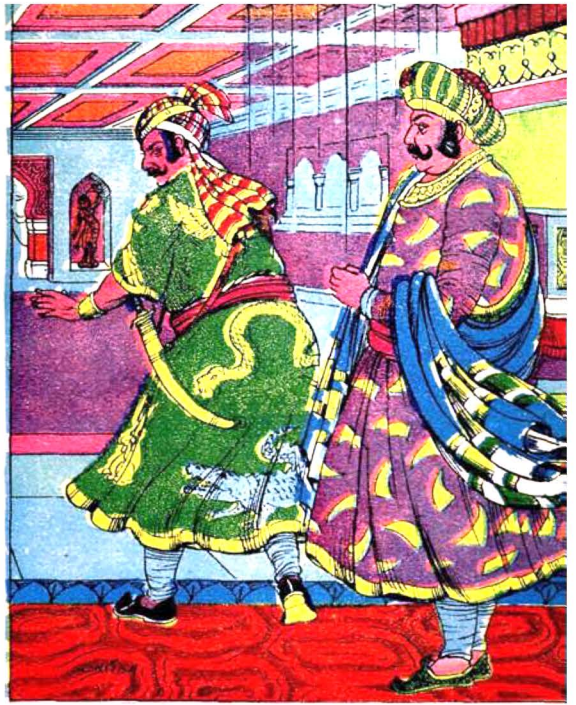
মন্ত্রী মাথা নেড়ে একটু কেশে বলল, "মহারাজ, এর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের উত্তর প্রান্তে এক দল লোক উটে চড়ে এসেছে। তবে এ যে ধরণের আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বলছে তাতে মনে হচ্ছে..."

ওর কথা শেষ হতে না হতেই সেনাপতি খাপখোলা তরবারি নিয়ে এসে রাজা ও মন্ত্রীকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

মন্ত্রী তার নমস্কার করার পর চিড়িয়া-খানার অধিকারীর বক্তব্য পরিবেশন করে বলল, "আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে

যে দেশের ভিতরে উত্তর প্রান্ত থেকে কোথাকার কোন রাজার সেনারা ঢুকে আমাদের লোকের উপর আক্রমণ করল অথচ সেনাপতির কিছুই জানা নেই। আপনি কি সীমান্তে গুপ্তচরদের রাখেন নি? আশেপাশের দেশে কি আমাদের গুপ্তচররা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে? কেন এরকম হোল? কেন আপনি জানেন না?"

মন্ত্রীর কথা শুনে সেনাপতি অবাক হল। চিড়িয়াখানার অধিকারীর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে চিড়িয়াখানার অধিকারী যা বলেছেন তার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে। তবে যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে বেশির ভাগ কথাই তাঁর বানানো। উত্তর প্রান্তে উটের পিঠে চড়ে কিছু লোকের আসার খবর পেয়ে আমি ইতিমধ্যেই গুপ্তচর পাঠিয়েছি। কিন্তু গুপ্তচরদের মধ্যে সবচেয়ে যে বিশ্বাসী ছিল সে বনের অধিবাসী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে উটে চড়ে আসা লোকদের সম্পর্কে সঠিক খবর এখনও আমার কাছে এসে পৌঁছায় নি।"

"এই যে দেরি হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয় শত্রু নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। পাঠালেন তো পাঠালেন এমন এক অবিবাহিত যুবককে পাঠালেন যে শত্রু পক্ষের মেয়েকেই ভালবেসে বিয়ে করে ওদের খপ্পরে পড়ে গেল। এবার বুঝলেন তো কোন অবিবাহিতকে গুপ্তচর বিভাগে রাখা কতখানি ক্ষতিকর।" মন্ত্রী রাগে গুরুগম্ভীর গলায় বলল।

রাজা গোঁফে তা দিয়ে বললেন, "সেনাপতি আর দেরি করা যে কোন ক্রমেই উচিত নয় তা তো বুঝতে পারছ। শত্রুপক্ষের রাজার নাম যে সমরবাহু তাও জানলে। এরা আরও জানিয়েছে যে ওরা পাহাড়ের উপরে একটা দুর্গও তৈরি করেছে। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি আর কালমাত্রও বিলম্ব না করে এক্ষুণি সেনা নিয়ে এগিয়ে যাও। ওদের

হত্যা কর। আর ঐ সমরবাহুকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে এস।”

“জে-আজ্ঞে মহারাজ।” একথা বলে সেনাপতি রাজা ও মন্ত্রীকে নমস্কার করে চলে গেল। সেনাপাত একশো ঘোড়-সওয়ার ও দুশো পদাতিক সেনা নিয়ে সমরবাহু যেখানে দুর্গ বানাচ্ছিল সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

সমরবাহু যেদিন থেকে ভালুক জাতের লোকের হাতে বন্দী হয়েছিল সেদিন থেকে স্বর্ণাচারিই ছিল সমরবাহুর দলের নেতা। চিড়িয়াখানার অধিকারীর দলের সঙ্গে সমরবাহুর লোকের সংঘর্ষের পরেই স্বর্ণাচারি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত দুর্গের কাজ করতে লাগল। স্বর্ণাচারির একটা ব্যাপারে দুর্ভাবনা ছিল। তা হল, সমরবাহুর আসার আগেই যদি দুর্গ আক্রান্ত হয়, সেই দেশের রাজা যদি তাদের ধরে নিয়ে যায় তাহলে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত জানবে কি করে যে সে কোথায়? এই চিন্তাই স্বর্ণাচারির মনে গেঁথে রইল।

এসব কথা ভেবেই স্বর্ণাচারি ঠিক করল যে যে কোন ভাবে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে এবং তার জন্য চাই ভাল দুর্গ। দুর্গও যদি আক্রান্ত হয় তাহলে পালানোর জন্য সুড়ঙ্গ তৈরি করল দু-একটা। সমস্ত ব্যবস্থা করে অজানা বিপদের আশঙ্কায় দিন গুনতে লাগল।
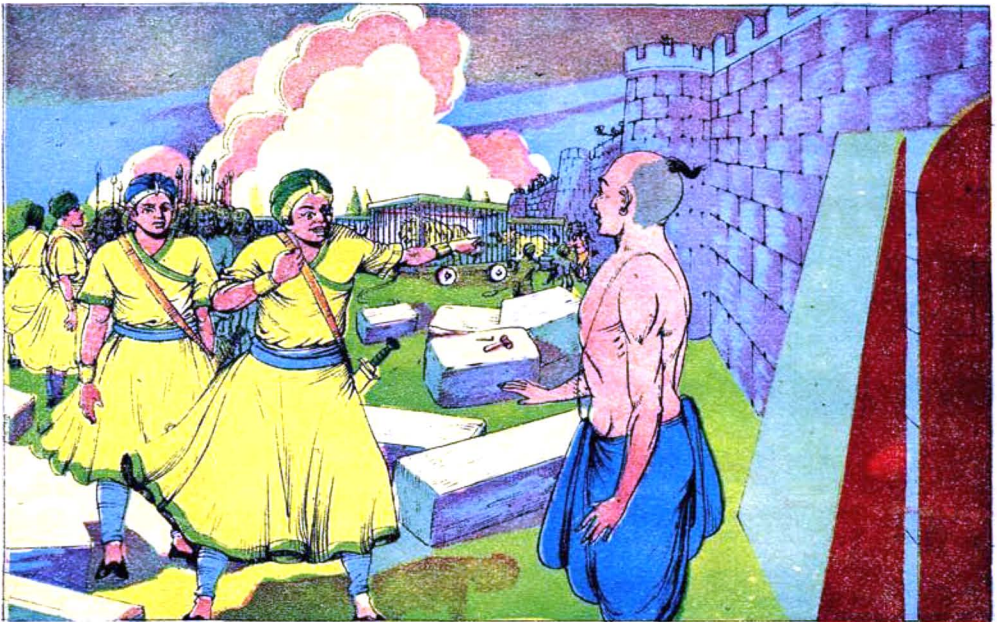
এতবড় কাজ করতে অনেক লোকের দরকার হয়েছে। তাই ঐ বনের বহু অধিবাসীকে হাত করতে হয়েছে। তাদের অনেক পয়সা কড়ি দিয়ে কাজ করাতে হয়েছে। বাঘ ও সিংহকে প্রতিরক্ষা শক্ত করার আশাতেই রাখা হয়েছিল। শত্রু যখন আক্রমণ করতে আসবে তখন প্রয়োজন বোধে ঐ বাঘ ও সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাঘ সিংহের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যখন শত্রু সেনারা ছোটাছুটি করবে তখন বিভ্রান্ত হয়ে, হকচকিয়ে গিয়ে কি ঘটেছে বুঝতে না পেরে বনের অধিবাসীদের বহু লোক হয় বন ছেড়ে পালাবে আর না হয় পয়সার লোভে ঐ দুর্গে ঢুকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে।

স্বর্ণাচারি সমস্ত দিক থেকে যখন প্রস্তুত হয়ে গেল তখন সে খবর পেল যে বীরপুরের সেনারা আক্রমণ করতে আসছে। স্বর্ণাচারি নিজের লোকের হাতে বল্লম দিয়ে বলল যে, যে মুহূর্তে শত্রু সেনা পাহাড়ের নিচে পৌঁছে যাবে তক্ষুণি কোন কথা না বলে, কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই যেন তারা বল্লম ছোঁড়ে তাদের দিকে।

বীরপুরের সেনাপতির নেতৃত্বে একশো ঘোড়সওয়ার ও দুশো পদাতিক সৈন্য পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি উচ্চস্বরে বলল, "ওহে শোন! আমি বীরপুরের সেনাপতি বলছি, তোমরা তোমাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর। আর তা না হলে তোমাদের প্রত্যেককে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে।"

আর সেই মুহূর্তে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লম বীরপুরের সেনাদের উপর পড়তে লাগল। সেই বল্লম-বৃষ্টির হাত থেকে সেনাপতিও নিস্তার পায় নি। তার কাঁধেও বিদ্ধ হল একটি বল্লম। সে আর্তনাদ করতে লাগল।

(আরও আছে)

কথা না রাখা

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে গেলেন সেই বৃক্ষের কাছে। সেখান থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, "রাজা, তুমি কাউকে কথা দিয়ে বসে আছ কিনা জানি না। আমি এও জানিনা যে পাছে কথা রাখতে পারবে না ভয়ে তুমি এই গভীর রাতে পরিশ্রম করছ কিনা। তবে একটা কথা জেনে রেখো, যখন কোন ক্রমেই কথা রাখতে পারবে না তখন কথা না রাখলেও পার। বীরসিংহের মত রাজাও কথা দিয়েছিল কিন্তু নিরুপায় হয়ে কথা সে রাখতে পারেনি। আচ্ছা, তোমাকে শোনাচ্ছি সেই কাহিনী। এতে তোমার পরিশ্রম কমবে, ভালও লাগবে।"

বেতাল কথা

বেতাল বীরসিংহের কাহিনী শুরু করল ঃ বীরসিংহ যখন যুবরাজ ছিল তখন সে যখন তখন শিকার করতে বনে যেত। সে ছিল খুব সাহসী। একদিন শিকার করতে করতে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খেতে একটা পুকুরের কাছে গিয়ে দেখল এক বনবাসী যুবতীকে স্নান করতে। সেই রূপলাবণ্যময়ী যুবতীকে দেখে রাজার চোখের পলক পড়ল না। সে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। বীরসিংহ সেই যুবতীর কাছে গিয়ে বলল, "তুমি এত সুন্দরী যে তোমাকে এই বনে বাদাড়ে রাখা কোন ক্রমেই উচিত নয়। তুমি চল আমার সঙ্গে। আমাকে বিয়ে করে জগতের সমস্ত রকমের সুখ আনন্দ ভোগ কর।"

"আমার গর্ভের সন্তানকে যদি আপনি রাজা করে সিংহাসনে বসান তবে আমি বিয়ে করব।" যুবতী বলল। বীরসিংহ তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। তাকে বিয়ে করে সুখে জীবন যাপন করতে লাগল।

কিছুদিন পরে বীরসিংহ আবার শিকার করতে সেই বনে গেল। শিকার করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণাও পেল তার। তখন সে ঐ পুকুরে গেল জল খেতে। গিয়ে দেখে সে যাকে বিয়ে করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী এক যুবতী পুকুরে স্নান করছে। যুবরাজ তার কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল।

দ্বিতীয় বনবাসী যুবতীও প্রথম যুবতীর মত শর্ত রাখল। তার গর্ভজাত সন্তান রাজা হওয়ার অধিকার পেলে সে বিয়ে করবে। বীরসিংহ এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে তাকেও বিয়ে করে নিয়ে গেল রাজমহলে।

আবার কয়েক মাস পরে বীরসিংহ শিকার করে ফেরার পথে ঐ পুকুরের কাছে জল পান করতে এসে যা দেখল তাতে তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। এমন এক পরমাসুন্দরী যে ঐ ধরণের বনে থাকতে পারে তা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বীরসিংহ তাকেও বিয়ে করতে চাইল। তৃতীয় যুবতীও প্রথম ও দ্বিতীয় যুবতীর মত শর্ত রাখল বীরসিংহের কাছে।

বীরসিংহ সেই অপরূপা যুবতীর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

এভাবে বীরসিংহ পর পর তিনজন বনবাসী যুবতীকে একই রকমের কথা দিয়ে, একই ধরণের শর্তে রাজী হয়ে বিয়ে করেছিল। যাই হোক, বীরসিংহ তৃতীয় যুবতীকে বিয়ে করে রাজমহলে ঢুকল।

কিছুদিন পরে আবার বীরসিংহ শিকারে গেল। শিকার সেরে সেই পুকুরের ধারে জল খেতে এসে তার নজরে পড়ল এক বনবাসী যুবতী। তবে আগের যুবতীদের মত তার রূপ নেই। সাধারণ এক যুবতী।

বীরসিংহের মনে এই সাধারণ মেয়ের প্রতি ও দুর্বলতা জাগল। সারল্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, "তুমি এত চিন্তিত কেন? কি তোমার পরিচয়? এখানে গালে হাত দিয়ে বসে আছ কেন?"

"আমার তিন বোন আমাকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছে। আমি এখন একা এখানে পড়ে আছি! আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করব!" যুবতী বলল।

বীরসিংহ বুঝতে পারল যে তার বউরাই এই যুবতীর তিন বোন। তখন সে ঐ যুবতীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। একে নিয়ে বীরসিংহের চার স্ত্রী হল।

কিছুকাল পর বীরসিংহ রাজা হল। তার কিছুদিন পর চার বউয়ের চার ছেলে হল।

চার ছেলের মধ্যে চতুর্থ স্ত্রীর পুত্র অন্য ছেলেদের মত ছিল না। সে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বাপের কাছে বেশি ঘেষত না। আপন মনে নিজের কাজে জড়িয়ে থাকত। বড় ভাইদের সঙ্গেও মিশতো না। সে সুযোগ পেলেই বনে গিয়ে বনের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করত। আর বাকি তিন ছেলে বাপের কথামত চলত। মন্ত্রীরও ধারণা ছিল রাজা ঐ তিন জনের মধ্যেই একজনকে সিংহাসনে বসাবে। রাজা চতুর্থ রাজকুমারকে কোন কাজের ভার দিলে নিজে তা না করে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিত।

চতুর্থ রাজকুমারকে বনের অধিবাসীরা নেতা হিসেবে নির্বাচন করল।

এদিকে রাজা বীরসিংহের বয়স বাড়তে লাগল। রাজার পরে কে সিংহাসনে বসবে তা ঠিক করে দেবার জন্য মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞেস করল। মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা বনে গিয়ে চতুর্থ রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে তাকেই রাজা করে দিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা এখন তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বীরসিংহ কেন চতুর্থ রাজকুমারকে রাজা করল ? এর ফলে বাকি তিন বঁউকে যে কথা দিয়েছিল তার ভঙ্গ হয়নি কি ? এইভাবে রাজার কথা না রাখা কি উচিত ? এটা কি ছোটর প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয় ? অন্য রাজ-কুমারদের প্রতি উপেক্ষা নয় ? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান জেনেও যদি না জানাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথা শুনে বিক্রমাদিত্য জবাব দিলেন, "রাজা বীরসিংহ চতুর্থ ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে কোন শর্ত ভঙ্গ করেন নি বরং তিনি দুরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। রাজা যখন দ্বিতীয় রাণীকে কথা দিলেন তখনই প্রথম রাণীর শর্ত নষ্ট হয়ে গেল। এইভাবে চতুর্থ রাণীকে কথা দেওয়ার সাথে সাথে আগের তিন রাণীকে যে কথা দিয়েছিলেন তার কোন দাম রইল না। বনবাসী যুবতীদের শর্ত আরোপের মধ্যে যত না যোগ্যতা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল মোহ। কিছু না ভেবেই ওরা শর্ত করেছিল। বড় তিন রাণীর ছেলেদের ছিল গোলামীর মনোভাব। তাদের যা করতে বলা হত তাই করত। কিন্তু ছোট রাজকুমার তা করত না। তার রাজা হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা তা প্রথম বুঝেছিল বনের অধিবাসীরা। তাই রাজা যোগ্য রাজকুমারকেই রাজা করেছিলেন। তিনি কোন ভুল বা শর্ত ভঙ্গ করেন নি।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

শোধ

এক গ্রামে নিরাপদ নামে একটা লোক ছিল। একবার তার কোন এক দরকারে পাঁচশো টাকার প্রয়োজন পড়ল। গ্রামের লোকের কাছে ধার চাইল! কিন্তু কেউ তাকে ধার দিতে রাজী হল না। শেষে হতাশ হয়ে মন্দিরে ঢুকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল, "ঠাকুর আজ আমি যত টাকা পাব তার অর্দ্ধেক তোমাকে দেব। আমাকে যে কোন ভাবে টাকা পাইয়ে দাও ঠাকুর।"

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল সেই দিনই সে ক্ষেতে কাজ করার সময় মাটি খুঁড়ে পেল একটা হাঁড়ি। সেই হাঁড়িতে ছিল এক হাজার টাকা। নিরাপদ খুব খুশী হল। টাকা সব স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে সে ঠাকুরের কাছে যে মানত করে ছিল তাও জানাল।

নিরাপদর স্ত্রী বলল, "তুমি যত টাকাই ঠাকুরের নামে দাও, সব টাকা মন্দিরের স্বত্ত্বাধিকারী মেরে দেবে। তার চেয়ে ঐ টাকায় গরিব লোকদের খাওয়াতে পার।"

নিরাপদ গাঁয়ের মোড়লকে সব কথা জানাল। মোড়ল খুশী হয়ে সারা গাঁয়ে ঢাক-পিটিয়ে এই খবর প্রচার করে দিল। পরের দিন গরিবদের অন্নদান করা হবে।

মন্দিরের স্বত্ত্বাধিকারী এই খবর পেয়ে ছুটে এসে বলল, "এতো ভারি অন্যায় কথা! ঠাকুরকে দেব বলে টাকা মন্দিরে জমা না দেওয়া মস্ত বড় অপরাধ।"

মোড়লের কিছু বলার আগেই মন্দিরের স্বত্ত্বাধিকারী আবার বলল, "মন্দিরের প্রাপ্য টাকা দিয়ে গরিবদের খাওয়ানোর কোন অধিকার নিরাপদর নেই।"

গনেশ দেবশর্মা

মোড়ল নিরাপদকে ডেকে পাঠিয়ে মন্দিরের স্বত্বাধিকারীর সব কথা জানিয়ে পরামর্শ দিল নিরাপদ যেন পাঁচশো টাকা মন্দিরেই জমা দেয়। কথাটা শুনে নিরাপদর খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

মাথা নিচু করে কি যেন আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল নিরাপদ। মোড়লের আর মন্দিরের স্বত্বাধিকারীর সব কথা বউকে জানিয়ে বলল, "যাই হোক, গরিবদের খাওয়াব বলেছি। খাওয়াবই। আর বাকি পাঁচশো টাকা মন্দিরের স্বত্বাধিকারীর হাতে তুলে দেব।"

তক্ষুনি নিরাপদর বউয়ের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে নিরাপদর কানে কানে কি যেন বলে দিল।

পরের দিন পাঁচশো টাকা খরচ করে নিরাপদ গরিবদের যথারীতি খাওয়াল কিন্তু স্বত্বাধিকারীকে টাকা দিল না। তখন স্বত্বাধিকারী ছুটে এসে মোড়লের কাছে অভিযোগ করল, "কি ব্যাপার, নিরাপদ এখনও টাকা দিয়ে গেল না কেন?"

মোড়ল ডেকে পাঠিয়ে নিরাপদকে জিজ্ঞেস করায় সে জবাবে বলল, "আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি কাল ঠাকুরের কাছে আরও এক হাজার টাকা পাইয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করেছি। মানত করেছি এক হাজার পেলে অর্দ্ধেক টাকা, মানে পাঁচশো টাকা ঠাকুরকে দেব। কিন্তু আমি ঐ এক হাজার টাকা এখনও পেলাম না। আমার ধারণা, ঠাকুর এই এক হাজার আমাকে আর দেবেন না। আগের পাঁচশো আর এই হাজারের পাঁচশো মোট এক হাজার টাকা ঠাকুর ধার শোধ বাবদ কেটে রেখে দিয়েছেন।"

এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে মন্দিরের স্বত্বাধিকারী আর মুখ খুলতে পারল না। মোড়লেরই বা আর কী বলার থাকতে পারে।

জল রাখার ভাড়া

কেশব নামে এক কৃষকের একটা কুয়ো ছিল। সে ছিল খুব গরিব। এত গরিব যে শেষ পর্যন্ত কুয়োটাকেও না বিক্রি করে পারল না। পবিত্র নামে এক পয়সাওয়ালা কৃষক ঐ কুয়োটাকে কিনে নিল ছ'শো টাকায়।

কঠিন পরিশ্রম করে কেশব কিছু রোজগার করল? সে ঠিক করল কুয়োটাকে আবার কিনে নেবে। তাই সে গেল পবিত্রের কাছে। তাকে বলল, "তোমার টাকা তোমাকে ফেরত দিচ্ছি, তুমি দয়া করে আমার কুয়ো আমাকে ফেরত দাও।"

"যা দিয়েছি তার দ্বিগুণ টাকা দিলে কুয়ো তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি।"

কেশবের খুব রাগ হল। সে গেল মোড়লের কাছে। জানাল সব। মোড়ল ডেকে পাঠাল পবিত্রকে। পবিত্র মোড়লের কাছেও একই কথা বলল।

তখন কেশব বলল, "আমি কুয়ো বিক্রি করেছি বটে তবে তার জল তো বিক্রি করিনি। অতএব, কুয়োর জল আমার।"

পবিত্র বলল, "মোড়ল মশাই, কেশবকে এক্ষুণি সমস্ত জল নিয়ে যেতে বলুন। আর তা নাহলে জল রাখার ভাড়া হিসেবে আমাকে মাসে পনের টাকা দিতে হবে।"

কথার প্যাঁচে হেরে যাওয়ায় লজ্জা পেয়ে কেশব মাথা নিচু করে রইল।
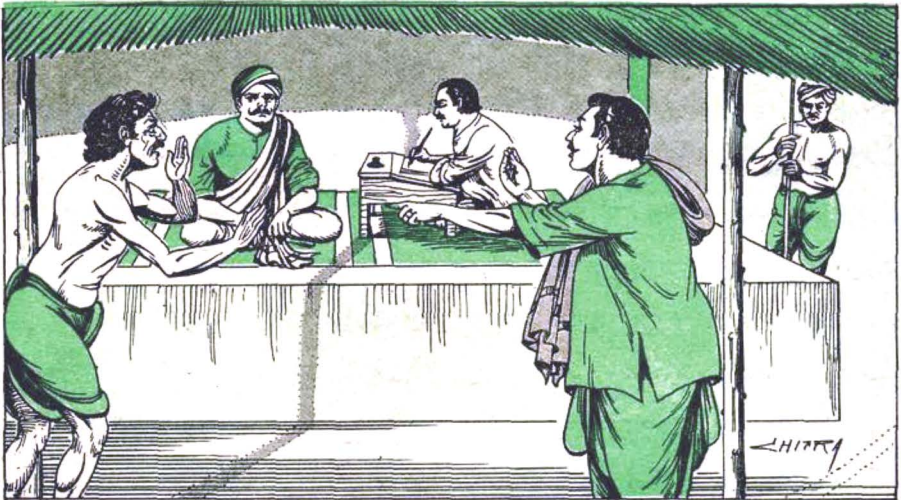
বিচারের চাতুর্য

প্রাচীনকালে কাঞ্চিপুরে ইন্দ্রভূপতি নামে এক জৈন মুনি ছিলেন। তাঁর দর্শন লাভের ইচ্ছায় দুজন জৈন যাত্রা শুরু করল। পথে ঐ দুজন একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করল।

দুজনে সেখানে খাবারের পোঁটলা খুলল। ঠিক তখনই একটি কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে সেখানে এল। ওদের দুজনের মধ্যে একজন কুকুরের প্রতি দয়ালু হয়ে খাবারের কিছু অংশ সেই কুকুরটাকে দিল। তারপর সে জল আনতে পুকুর ঘাটে গেল। যাওয়ার আগে সে ঐ খাবারের পোঁটলাটাকে গাছের একটি খোপরে পুরে রাখল। জল নিয়ে ফিরে এসে দেখে কুকুর সেই খোপর থেকে খাবার বের করে চেটে পুটে খেয়ে নিয়েছে।

তখন জৈন সাধুর খুব রাগ হল। সে তার জল ভর্তি পাত্রটিকে কুকুরের দিকে ছুঁড়ে মারল। আঘাত পেয়ে আর্তনাদ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

"কুকুরকে বিশ্বাসী জন্তু বলা ভুল। আমি এই কুকুরটাকে খাবার দিলাম, তা সত্ত্বেও সে আমার খাবার খেয়ে নিল। এই ধরণের কুকুরকে মেরে ফেললেও পাপ হয় না। জৈন সাধুটি বলল।"

এ কথা শুনে দ্বিতীয় জৈন সাধু বলল, "এখন আমি ঠিক বলতে পারি না যে কুকুর বিশ্বাসঘাতক নয়। তবে যা ঘটে গেল তাতে আমাদের যে কোন ভুল হয়নি তা বলা যায় না। আমাদেরও ভুল হয়েছে। আমরা এমন ভাবে পোঁটলাটাকে রেখে-ছিলাম যে কুকুর অনায়াসেই সেটা বের

নিবারণ মিত্র

করতে পারল। যাদের বিবেক আছে তারাই যদি ভুল করে তাহলে বিবেকহীন কুকুর যে ভুল করবে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে। তার জন্য কুকুরকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে মারা উচিত নয়।"

"ও যেমন কাজ করেছে তেমনি শাস্তি দিয়েছি।" প্রথম জৈন সাধু বলল।

"কুকুর ভুল করেছে আমার নন্দীবর্মার কাণ্ডকারখানার কথা মনে পড়ছে।" দ্বিতীয় জৈন সাধু বলল।

"নন্দীবর্মা কে? কি এমন কাণ্ড করল?" প্রথম জৈন্যের প্রশ্ন।

দ্বিতীয় জৈন প্রথম জৈনকে খাবারের অর্দ্ধেক অংশ ভাগ দিয়ে খেয়ে উঠে বলল, নন্দীবর্মা কাঞ্চিপুরের শাসক ছিল। লোকটা ছিল সুবিবেচক এবং সুবিচারক। দেশে যত রকমের অপরাধ হত সব বিচারের ভার তার উপর পড়ত।

একবার মহামুনি ইন্দ্রভূপতি রাজাকে আশীর্বাদ করতে রাজপ্রাসাদে এলেন। সেই সময়ে রাজা এক চুরির অপরাধের বিচার করছিলেন। চোর এক ব্যবসায়ীর ঘরে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। রাজা বিচার করে চোরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তারপর মহামুনি ইন্দ্রভূপতির দিকে তাকিয়ে রাজা নন্দীবর্মা বললেন, "মহামুনি আমি ঠিক বিচার করেছি তো?"
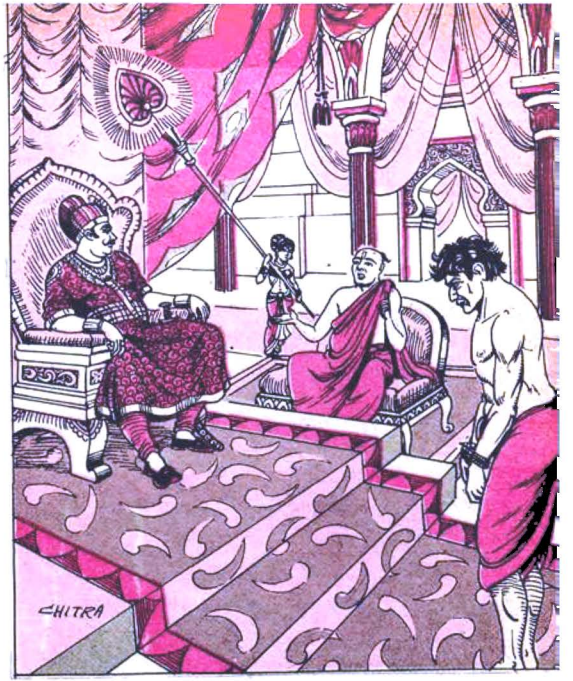
"আমি এর মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির কোন পরিচয় পাইনি। চোর চুরি করেছে, শাস্তি পেয়েছে। এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। এইভাবে কখনও চুরি বন্ধ করা যায় না। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে চোর হয়ত শাস্তি নাও পেতে পারে। তবে এই জগৎ সংসারে সেই ধরণের বিচার আর কোথায় হয়।" ইন্দ্রভূপতি বললেন।

একথা শুনে রাজার মুখ চুন হয়ে গেল। ইন্দ্রভূপতি আবার বললেন, "সূক্ষ্ম ও সঠিক বিচারে এই শাস্তি হয়ত পাওয়া উচিত এই দেশের রাজা ও ব্যবসায়ীর।"

রাজার মুখ ঝুলে গেল। ব্যবসায়ী ভেবে পেল না তার কি অপরাধ। কিন্তু

কারও সাহস হল না ইন্দ্রভূপতিকে মুখের উপর প্রশ্ন করার।

রাজা ও ব্যবসায়ীর হাবভাব দেখে ইন্দ্রভূপতি বলতে লাগলেন, "সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও সোমদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ দেব সম্পত্তি চুরি করলেন। তিনি এই চুরিকে চুরি মনে করেন নি।"

রাজা সোমদত্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে ইন্দ্রভূপতি বললেন, একবার জৈনদের প্রত্যক্ষ দেবতা বর্দ্ধমান তপস্যা করছিলেন। দেবেন্দ্র দু-জোড়া বস্ত্র বর্দ্ধমানকে উপহার দিলেন। বর্দ্ধমান একটি বস্ত্র পরিধান করলেন আর একটি গায়ে দিলেন ; বাকি জোড়া রেখে দিলেন। একদিন বর্দ্ধমানকে দর্শন করতে এসে মহাপণ্ডিত সোমদত্ত এক জোড়া বস্ত্র দেখে তাঁকে বললেন, "প্রভু, আমাকে কি একটি বস্ত্র দান করতে পারেন না ?"

বর্দ্ধমান একটি বস্ত্র সোমদত্তকে দিয়ে ধ্যানে বসলেন। সোমদত্তের ঐ একটি বস্ত্রে মন ভরলো না। তখন অন্য বস্ত্রটিকেও চুরি করে সোমদত্ত চলে গেলেন।

"বর্দ্ধমান ধ্যান ভঙ্গ হওয়ার পর চেয়ে দেখেন, অন্য বস্ত্রটি নেই। বর্দ্ধমান কিছুক্ষণ ভেবে মনে মনে বললেন, সোমদত্ত যখন একটা কাপড় চেয়েছিল, তখন আমারই উচিত ছিল তাকে দুটোই দিয়ে দেওয়া। তাহলে সে আর চুরি করত না। ওর চুরি করার জন্য আমিই দায়ী, ও নয়। অন্যের কাছে যে জিনিস নেই তা নিজের কাছে রাখাই তো অন্যায়। পরক্ষণে তিনি কাপড় দুটো ছিঁড়ে অনেকগুলো কৌপিন করে, নিজে একটি পরে, বাকি কৌপিনগুলো বহু শিষ্যকে দিয়ে দিলেন।"

এই কাহিনী শুনে নন্দীবর্মা খুব লজ্জা পেলেন। রাজা চোরকে কিছু উপহার দিয়ে মুক্তি দিলেন। এ কথা শুনে প্রথম জৈন সাধু নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুকুরকে মারার জন্য অনুতপ্ত হল।

আসল কবি

এক দেশে ছিলেন এক খাঁ সাহেব। কবি ও গায়করা কবিতা শুনিয়ে ও গান গেয়ে তাঁকে খুশী করত। একবার খাঁ সাহেব মন দিয়ে গান শুনলেন। সেই গানে খাঁ সাহেবের ক্রূরতা ও অন্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করা ছিল। তিনি ভীষণ চটে গিয়ে ঐ গান যে কবি লিখেছে তাঁকে ডেকে আনতে বললেন। কিন্তু সেই কবির পাত্তা কেউ পেল না। তখন তিনি দেশের সমস্ত কবিদের বন্দী করে জিজ্ঞেস করলেন, "কে আমার প্রতি বিদ্রূপ করে গান লিখেছে বল।

কেউ কোন কথা বলল না।

খাঁ সাহেব তখন এক একজন কবিকে বললেন, "তুমি কোন কবিতা বা গান লিখেছ পড়।" প্রত্যেকে যে যার রচনা পাঠ করল। শুধু একজন কবি পড়ল না। প্রত্যেকে খাঁ সাহেবের দানশীলতা ও দয়ার প্রশংসা করেই কবিতা বা গান লিখেছিল। কিন্তু এই কবির নীরব থাকায় খাঁ সাহেব চিতা বানিয়ে তার উপর সেই কবিকে দাঁড় করিয়ে বললেন, "তুমি যদি তোমার কবিতা ও গান না পড় তাহলে তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।" কিন্তু কবি চিতার উপর দাঁড়িয়ে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কোন কথা বলল না। কবিতা পাঠ করল না। কোন গান গাইল না।

চিতায় আগুন ধরানোর সময় কবি সেই গান গাইল যে গানে খাঁ সাহেবের নিন্দে করা হয়েছিল। খাঁ সাহেব চিৎকার করে বললেন, "ওরে আগুন ধরাস নি। ওকে চিতা থেকে নাবা। ঐ হল একমাত্র সত্যিকারের কবি। খাঁটি কবি!"
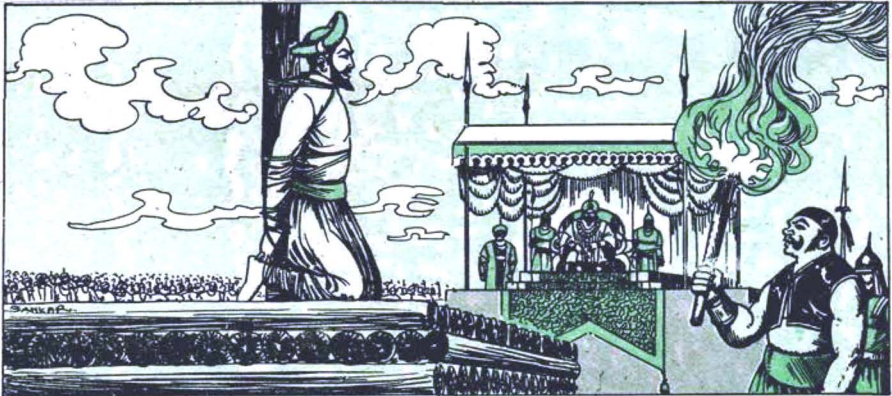
অতিলোভ

কোন এক গ্রামে শুভ শাস্ত্রী নামে এক পুরোহিত ছিল। আশেপাশে যত পূজো হত, লোকে শুভ শাস্ত্রীকেই ডাকত। একবার পাশের গাঁয়ের এক ব্যবসায়ীর কন্যার বিয়ে সেরে অনেক মণ্ডা মিঠাই দক্ষিণা নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিল শুভ শাস্ত্রী।

বন পথে ফিরছিল শুভ শাস্ত্রী। পথে ঘন অন্ধকার। ঘন গাছপালার ফলে অন্ধকার আরও ভয়ঙ্কর লাগছিল। তবে চেনা পথে হাঁটতে শুভ শাস্ত্রীর অসুবিধা হচ্ছিল না। একটি তেঁতুল গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কে যেন বলে উঠল, "ঠিক সময়েই এসেছ দেখছি। সকাল থেকে না খেয়ে আছি। বহু দিন ধরে নর মাংস খাইনি।"

পিশাচের গলা চিনতে পেরে শুভ শাস্ত্রী খুব ভয় পেল। কম্পিত বুকে সে তাকে বলল, "দেখ, তুমি যদি নর মাংস খেতে শুরু কর তাহলে কিন্তু এখানে কোন মানুষ আর আসবে না। আমার মাংসের চেয়ে সুস্বাদু খাদ্য আমি তোমাকে খেতে দিতে পারি। তোমার ভাল লাগে কিনা একবার যাচাই করে দেখ।

"কোই দেখি, কি জিনিস!" বলল পিশাচ।

শুভ শাস্ত্রী যে খাবারের পোঁটলা বেঁধে বিয়ে বাড়ি থেকে এনেছিল সেইগুলো পিশাচের সামনে মেলে ধরল।

"বা, বা, বেশ লাগছে তো খেতে! একি মাত্র এটুকুই! আর নেই? বলল পিশাচ।

স্বপন কুমার চৌধুরী

"আরও খেতে চাও তো পরে এনে দিতে পারি। তবে কথা কি জান এসব খাবার বানাতে হলে অনেক খরচ করতে হয়। আমি গরিব ব্রাহ্মণ। আমার কাছে পয়সা থাকলে আমি তোমাকে রোজ এসব খাবার এনে খাওয়াতে পারতাম।" শুভ শাস্ত্রী বলল।

"আরে টাকা পয়সার জন্য তুমি অত ভাবছ কেন? আমি দিচ্ছি।" বলে পিশাচ ঐ গাছের একটা খোপর থেকে অনেক সোনার মুদ্রা এনে শুভ শাস্ত্রীর হাতে দিল।

"তুমি রোজ এই সময় আমার জন্য খাবার আনবে। রোজ তোমাকে সোনার মুদ্রা দেব।" বলে পিশাচ চলে গেল। মনে মনে পিশাচের শুভ কামনা করে বাড়ি ফিরে গিয়ে সমস্ত সোনা বউয়ের সামনে রেখে দিল। বলল সব কথা বিস্তারিতভাবে।

স্বামী যে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে তা দেখে আনন্দিত হয়ে শুভ শাস্ত্রীর স্ত্রী বলল, "দেখুন, আপনি যে সোনা এনেছেন তাতেই আমাদের অনেক দিন চলবে। আর ওপথে যাবেন না। বাবা বিশ্বাস নেই, পিশাচ বলে কথা।"

একথা শুনে শুভ শাস্ত্রী বলল, "তোমার কথাই ঠিক। আর যাওয়া উচিত নয়।"
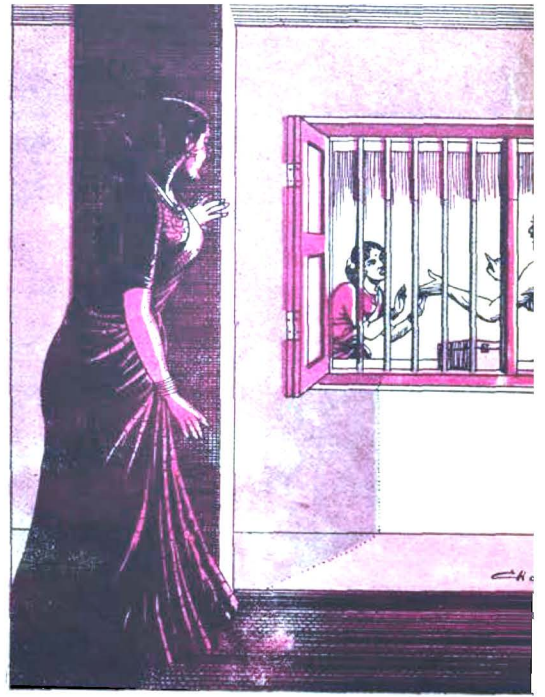
স্বামী-স্ত্রীতে যখন কথা হচ্ছিল তখন পাশের বাড়ির এক মহিলা ওদের বাড়িতে আসতে আসতে হঠাৎ আড়ি পেতে সব কথা শুনল সোনার অত মুদ্রা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। শাস্ত্রী দম্পতির কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তার স্বামীকে সব কথা বলল।

"দেখ, আমি ভাল ভাল খাবার বানিয়ে তোমাকে দেব তুমি ওগুলো নিয়ে ঐ তেঁতুল গাছের কাছে গিয়ে পিশাচকে খাবার খাইয়ে সোনার মুদ্রা নিয়ে এস। প্রত্যেকদিন আনলে আমরা অনেক তাড়াতাড়ি বিরাট বড়লোক হয়ে যাব।" বলল প্রতিবেশিনী তার স্বামীকে।

স্ত্রীর কথামত প্রতিবেশিনীর স্বামী মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার নিয়ে ঐ তেঁতুল গাছের কাছে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে পিশাচ ঐ গাছের কাছে এসে বলল, "খাবার এনেছ ?"

প্রতিবেশিনীর স্বামী সমস্ত খাবার পিশাচকে দিল। পিশাচ সব খাবার খেয়ে সেই গাছের খোপর থেকে অনেকগুলো সোনার মুদ্রা এনে তার হাতে দিল। তার পর বলল, তুমি প্রত্যেকদিন এইসব খাবার বানিয়ে আনবে। আমি তোমাকে প্রত্যেক-দিন সোনার মুদ্রা দেব।"

প্রতিবেশী দম্পতির লোভ ছিল কিন্তু প্রতিবেশিনীর স্বামী সোমরাজের সাহস ছিল না। পিশাচকে দেখেই তার বুক কেঁপে উঠেছিল। সে বউকে বলল, "দেখ, সোনা পেয়ে ভাল লাগছে। তবে পিশাচের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। মানে ভয় করে।"

"তাহলে এক কাজ কর। দিনের বেলা গিয়ে গাছের ঐ খোপরে যত সোনার মুদ্রা আছে সব নিয়ে পালিয়ে আসলেই তো হয়। দিনের বেলা তো আর পিশাচ থাকবে না।" বলল সোমরাজের বউ।

বউয়ের পরামর্শ সোমরাজের কাছে ভাল লাগল। পরের দিন সকালে একটা কুড়ুল নিয়ে গেল ঐ তেঁতুল গাছের কাছে। গাছ কেটে ঐ খোপরে দেখে শুধু কাঠ কয়লা। তবু পাছে বউ বিশ্বাস না করে এই ভয়ে সে ঐ কাঠ কয়লাই পোঁটলা বেঁধে বাড়ি আনল। এনে বউকে দেখিয়ে ঐ কাঠ কয়লা বাড়ির এক কোণে ফেলে দিল।

তৎক্ষণাৎ আগুন ধরে গেল বাড়িতে। সোমরাজ আর তার স্ত্রী কোন রকমে বাড়ির বাইরে আসতে পারল। তাদের বাড়ি বিষয় সম্পত্তি সব পুড়ে গেল। সব কিছু খুইয়ে ওরা খালি হাতে অন্য গ্রামের দিকে পা বাড়াল।
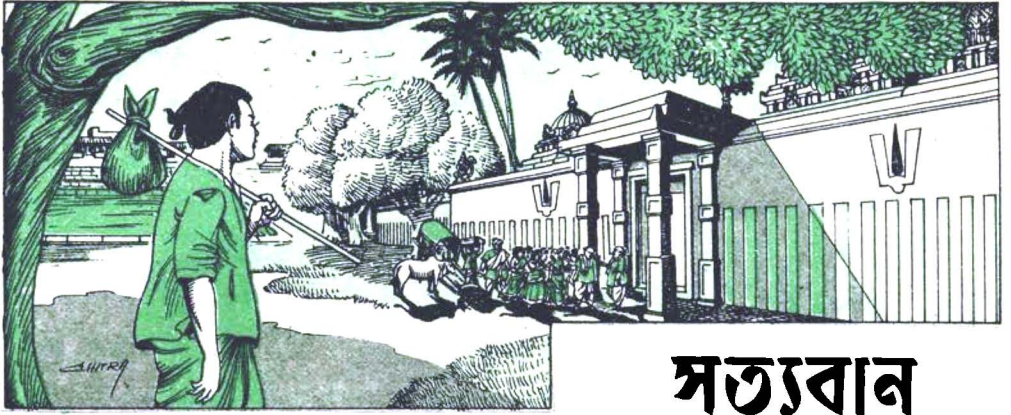
সত্যবান

এক গ্রামে ছিল এক বৈশ্য পরিবার। সেই পরিবারে ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দম্পতি। ছোটখাট একটা ব্যবসা করে পরিবারের খরচ চালাত ওরা। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যবসায় যা পেত তাতে সংসার চালাতে পারত না। তখন ঐ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একমাত্র ছেলে রামু ঠিক করল শহরে গিয়ে চাকরী করবে। তারপর টাকা পয়সা রোজগার করে বড় ব্যবসাদার হবে। ছেলের কথা শুনে বাবা মা খুশী হয়ে রামুকে শহরে যেতে বলল।

রামু কাপড় জামা শুকনো খাবার প্রভৃতি নিয়ে শহরের দিকে রওনা দিল। পথে পড়ল এক বড় পুকুর। আর তার পাশে ছিল অমরনাথের মন্দির। সেখানে বসে ছিল একদল বরযাত্রী। রাঘব সাহা নামে এক ধনী ব্যবসারী তার কন্যা যশোদার সঙ্গে অন্য গ্রামের জয়দেব সাহা নামে এক কোটি-পতির পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে। বরযাত্রী ও কনেযাত্রী এসে জড় হল ঐ মন্দিরের কাছে। বিয়ের লগ্নের তখনও অনেক দেরি ছিল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল।

রামু ঐ পুকুরে স্নান করে নিল। মন্দিরে ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম সারতে যাবার আগে সে ভাবছিল পোঁটলাটা কোথায় রাখবে। কাছেই একটা গাছের নিচে বসে থাকতে দেখল এক বৃদ্ধাকে। সেই বৃদ্ধার কাছে ছিল অনেকগুলো পোঁটলা।

রামু ঐ বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বলল, "দিদিমা, আমি স্নান সেরে দেবদর্শন করে আসছি। আপনি দয়া করে আমার এই পোঁটলাটা রাখবেন?" বুড়ি মাথা নেড়ে রাজী হল। রামু তার কাছে পোঁটলাটা

পবিত্র ভট্টাচার্য

রেখে স্নান সেরে দেবদর্শন করে প্রার্থনা করে বলল, "ঠাকুর আমি যে কাজে যাচ্ছি সে কাজে যেন সফল হতে পারি।"

তারপর সে বুড়ির কাছে ফিরে এসে পোঁটলাটা নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল।

কিছুদূর যাওয়ার পর ভীষণ খিদে পেল। একটা গাছের নিচে বসে জলযোগ করার জন্য পোঁটলাটা খুলেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তাতে জামা কাপড় বা খাবার ছিল না। ছিল সোনার গয়নাগাটি ও টাকা। ওটা ছিল কনে পক্ষের পোঁটলা। বুড়ি ভুল করে রামুকে অন্য পোঁটলা দিয়ে দিয়েছিল।

রামু কালমাত্র বিলম্ব না করে পোঁটলা নিয়ে সোজা অমরনাথ মন্দিরের কাছে এল। ততক্ষণে কনে পক্ষ ও বর পক্ষের মধ্যে তুমুল ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। কনেকর্তা রাঘব সাহা যখন বলল যে তার সমস্ত গয়না-গাটি ও টাকা হারিয়ে গেছে তখন বরকর্তা তাকে মিথ্যাবাদী, বেইমান বলে দোষারোপ করতে লাগল। এমন এক সময় উপস্থিত হল যে লগ্ন বুঝি চলে যায়। রাঘব সাহা কাকুতি মিনতি করে বলল, "এখন বিয়ে হয়ে যাক। পরে বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার প্রতিশ্রুতি মত সমস্ত গয়নাগাটি ও টাকা পয়সা এনে দেব। কিন্তু এই শুভ মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয়।" জয়দেবের বাবাকে কত করে বলল রাঘব। কিন্তু জয়দেবের বাবা কোন ক্রমেই এই প্রস্তাবে রাজী হল না।
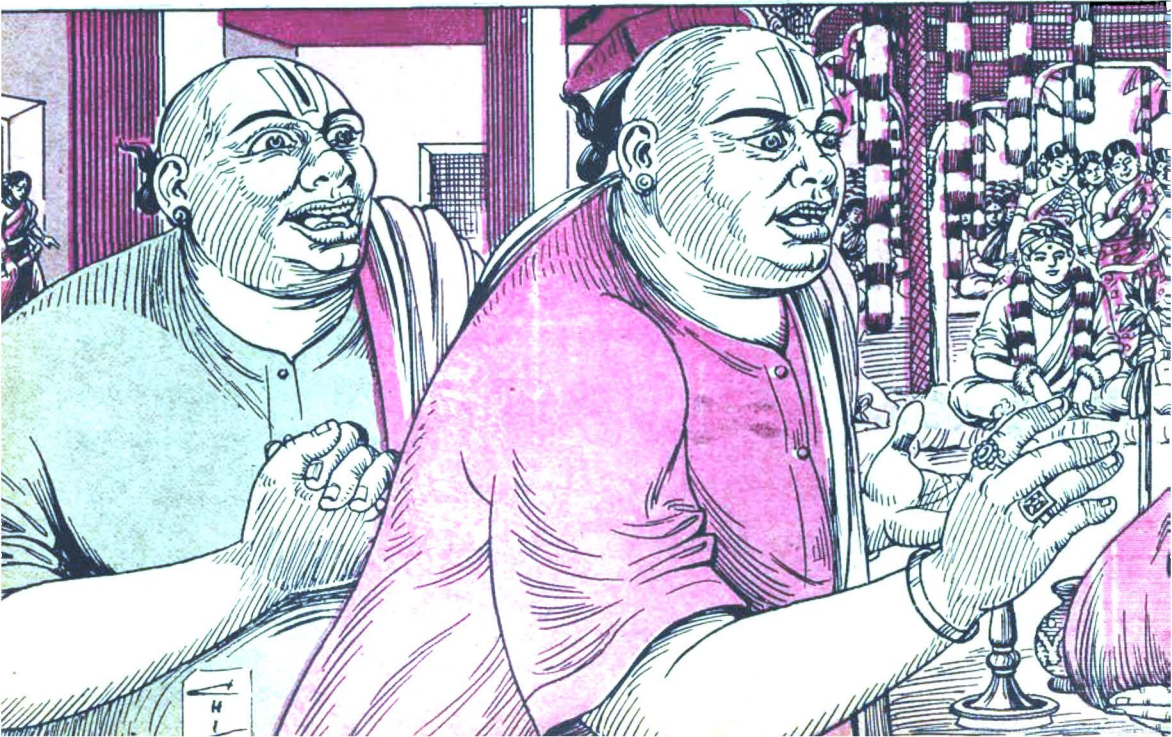
সে রেগে গিয়ে বলল, "আমাকে অপমান করা হয়েছে। আমি ছেলেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাব না। এ বিয়ে হবে না।"

ঠিক সেই মুহূর্তে রামু সেখানে এসে বলল, "শুনুন। আচ্ছা এই গাছের নিচে যে বুড়ি বসে ছিলেন সেই বুড়ি কোথায়?

"কেন? ঐ বুড়ি আমার মা। আমার মায়ের ভুলের জন্যই তো এত ঝগড়া হচ্ছে।" রাঘব সাহা বলল।

"এটা নিন। উনি আমার পোঁটলার পরিবর্তে এই পোঁটলাটা আমাকে দিয়েছেন। এতে সোনার গহনা ও টাকা পয়সা আছে। এটা নিয়ে আমার জামাকাপড় ও খাবারের পোঁটলাটা দিয়ে দিন।" রামু বলল।

বরযাত্রীর লোক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ ওরা ভেবেছিল রাঘব মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণিত হল। তারা ভুল স্বীকার করে আর সময় নষ্ট না করে বিয়ের কাজ শুরু করতে বলল।

রাঘব সাহা রামুকে মেয়ের কাছে এনে তার পরিচয় দিয়ে বলল মেয়েকে, "মা এই যুবকের নাম রামু। এর সততা ও নিষ্ঠার জন্য এই লগ্ন আর নষ্ট হল না।" তারপর রামুকে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করল রাঘব। রামু তাদের অতিথি হিসেবে বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকতে রাজী হল।

বিয়ের কাজ শুরু হল। রাঘব সাহা থালায় সাজিয়ে টাকা পয়সা গয়নাগাটি সব

বরপক্ষকে দিল। বিশেষ এক মুহূর্তে মালা বদলের পালা। শুভ দৃষ্টির পালা। জয়দেব যশোদার গলায় মালা দিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ যশোদা মাথা সরিয়ে জয়দেবকে বলল, "আমাকে মালা পরাচ্ছেন কেন? ঐ থালাতে মালা পরান। আপনি তো আমাকে চান না, চান সোনার গয়না, টাকা আর বিষয় সম্পত্তি। সব ঐ থালায় আছে। মালা পরান এই থালায়। আপনার যতই টাকা পয়সা আর সোনাদানা থাক আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা নেই। আপনার বলিষ্ঠ চরিত্র গঠিত হয়নি।"

তারপর যশোদা অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা রামুর দিকে দেখিয়ে বলল, "তাকিয়ে দেখুন ঐ যুবকের দিকে। ঐ যুবক গরিব। শহরে যাচ্ছেন চাকরি করতে। চাকরি খুঁজতে যাচ্ছেন। ভুলক্রমে তার হাতে পোঁটলাটা চলে গিয়েছিল। ঐ পোঁটলা-তেই এই সমস্ত সোনাদানা টাকা পয়সা ছিল। উনি এই পোঁটলা এনে ফেরত দিয়েছেন। যিনি গরিব, চাকরি খুঁজছেন তিনি কি এই পোঁটলা নিয়ে বাড়ি ফিরে সুখের জীবন-যাপন করতে পারতেন না। না তিনি সে পথে যান নি। কারণ তাঁর মধ্যে সততা আছে। একটি বলিষ্ঠ চরিত্র আছে। তাই বলছি আমি আপনার হাতে মালা পরব না। আপনার গলায় মালা পরাব না। আমি যদি মালা পরাই তো ঐ যুবকের গলায় পরাব।"

এই কথা শুনে বরপক্ষ হাহা করে উঠল। প্রত্যেকে কোন না কোন কথা বলতে লাগল। রাঘব কত করে মেয়েকে বোঝাল কিন্তু মেয়ে রামু ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে রাজী নয়। অবশেষে রামুকে বিয়ে করে যশোদা বাপের অপমানের প্রতিশোধ নিল। আর বরপক্ষের লোক অপমানে লজ্জায় মাথা নিচু করে পরাজিত সৈনিকের মত নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল।

রাজকুমারীর সাহস

বল্লভপুরের রাজা রঙ্গদিত্যের কোন সন্তান ছিল না। বহু বছর পরে তাঁর এক কন্যা হল। তার নাম রাখলেন সুখলতা। সেই কন্যা অত্যন্ত আদরে যত্নে লালিত পালিত হতে লাগল। রাজদরবারের সকলে রাজকন্যাকে অত্যন্ত আদর করত।

দিনে দিনে বড় হতে লাগল সুখলতা। একের পর এক কত বিদ্যা শিখল। তার পর শুরু করতে চাইল যুদ্ধবিদ্যা। অস্ত্র চালনা শিখতে চাইল। রাজা রঙ্গদিত্যের ইচ্ছে ছিল না সুখলতা যুদ্ধবিদ্যার ব্যাপারে আগ্রহী হোক। কিন্তু সুখলতা নাছোড়বান্দা। প্রত্যেকটা অস্ত্র চালনা শিখতে চায়। সে যে মেয়ে সে তা মনে রাখতে চায় না। সে এমন ভাবে অস্ত্র চালনা শিখতে চায় যাতে যে কোন রাজকুমারের সমকক্ষ হতে পারে। সে যেন মেয়ে নয় পুরুষ এমন ভাবে নিজেকে তৈরি করতে চায়।

সুখলতার বয়স যখন পনের বছর হল তখন বল্লভপুরের পশ্চিম প্রান্তের বনের অধিবাসীরা বিদ্রোহ শুরু করল। এই বিদ্রোহের খবর শুনে সুখলতা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলল, "আমি সেনা নিয়ে ঐ বিদ্রোহ দমন করতে চাই।"

মেয়ের কথা শুনে রঙ্গদিত্য থ বনে গেলেন। মেয়েটা বলে কি! কিন্তু রাজা জানেন তার মেয়েকে। চেনেন তার মেয়েকে। মেয়ে একবার যখন যেতে চেয়েছে, যাবেই। তখন রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "এই মেয়েকে নিয়ে তো মহা মস্কিলে পড়লাম। পশ্চিমের বিদ্রোহ দমন করতে এ যেতে চাইছে। কি করা যায়।"

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

“মহারাজ রাজকুমারীকে আপনি যত দুর্বল ভাবছেন, সে তত দুর্বল নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার মধ্যে সে সাহস এবং দক্ষতা রয়েছে তা দিয়ে সে পশ্চিমের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হবে। সেনারাও তার নির্দেশ মত সানন্দে চলবে বলে আমার বিশ্বাস।” মন্ত্রী ধীমান বুঝিয়ে বললেন।

“না না এতে আমি কিছুতেই রাজী হতে পারি না। ও ছেলেমানুষী করছে বলে কি আমাদেরও তাই করতে হবে! এ এক রকম পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। ওর যা বয়স তাতে সে পুতুল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র সাজাতে পারে। পুতুল যুদ্ধে সে জিততে পারে। কিন্তু তাকে বিদ্রোহীদের সামনে ঠেলে দেওয়া মানে তাকে আগুনে ঠেলে দেওয়ার সামিল। এ আমি সমর্থন করতে পারি না।” রাজা বললেন।

রাণীও রাজাকে সমর্থন করে বললেন, “মহামন্ত্রী আপনি কি বলছেন! আপনিও কি ঐ শিশুর মত কথা বলছেন না? মেয়েরা কখনও যুদ্ধ করতে পারে? আমাদের তো কত বড় বড় যোদ্ধা আছে। পাঠিয়ে দিন যে কোন যোদ্ধাকে। মেয়েকে পাঠানো কোন ক্রমেই উচিত নয়।”

“মহারাণী, রাজকুমারী সুখলতা বয়সে ছোট হতে পারে কিন্তু তার ক্ষমতা কোন অংশেই কম নয়। সমস্ত রকমের অস্ত্র চালনায় সে দক্ষ।” মন্ত্রী বললেন।

"যাই হোক, আমার মেয়ে যুদ্ধে যাক, এতে আমার মত নেই।" রাণী বললেন।

সুখলতা নিরাশ হয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকালে মন্ত্রী ইশারায় তাকে ভরসা দিলেন।

দরবারী জাদুকর কি যেন বলার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। অনুমতি পেয়ে বললেন, "রাজকুমারী যেতে চায় যুদ্ধে। মহামন্ত্রী তাকে যেতে দিতে চান। কিন্তু রাজা ও রাণীর অমত আছে। এ অবস্থায় ব্যাপার-টাকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।"

তৎক্ষণাৎ মেয়ে বলল, "বাবা, আপনি জাদুকরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান।"

রঙ্গদিত্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে, তবে তাই হোক।"

তখন জাদুকর ইন্দ্রপাল কতকগুলো কাগজের টুকরো ও কালি নিয়ে দূরে বসে পড়লেন। তারপর কলম হাতে নিয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, বিদ্রোহ দমন করতে আপনি কাকে কাকে পাঠাতে চান দয়া করে তাদের নাম একে একে বলুন।"

"গঙ্গাধর।" রাজা বললেন।

ইন্দ্রপাল গ-ঙ্গা-ধ-র উচ্চারণ করতে করতে একটি কাগজের টুকরোতে লিখে তা ভাঁজ করে এক পাশে রেখে দিলেন।

তারপর রাজাকে অন্য নাম বলতে অনুরোধ করাতে রাজা বললেন, "রঘুপতি।"

"র-ঘু-প-তি।" উচ্চারণ করতে করতে কাগজে লিখে ভাঁজ করে পাশে রেখে

দিলেন ইন্দ্রপাল। এবার রাজার কোন নাম বলার আগেই মন্ত্রী "সুখলতা" বললেন।

"সুখলতা।" উচ্চারণ করতে করতে একটি কাগজের টুকরোতে লিখলেন জাদুকর ইন্দ্রপাল।

এইভাবে ইন্দ্রপাল রাজার বলা আরও নয়টি নাম লিখলেন।

সমস্ত ভাঁজকরা কাগজের টুকরো রাজার কাছে ইন্দ্রপাল ধরে তার থেকে একটি তুলতে বললেন। রাজা একটি টুকরো তুললেন। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রপাল বাকি টুকরোগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

রঙ্গদিত্য কাগজের ভাঁজ খুলে আপন মনে বলে উঠলেন, "সুখলতা।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজাকে পাঠাতে হল সুখলতাকেই। সুখলতা দক্ষতার সঙ্গেই বিদ্রোহ দমন করে ফিরে এল রাজধানীতে।

রাজা ও রাণী সাদরে সুখলতাকে বুকে টেনে নিলেন।

তারপর একদিন রাজকুমারী মন্ত্রী ও ইন্দ্রপালকে নিজের কক্ষে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "মহামন্ত্রী, আপনি যে কি ভাবে কি করলেন আমি বুঝতে পারিনি।"

"মা, আমি কি বলব বল। যা করার সব ঐ জাদুকর ইন্দ্রপালই তো করলেন।" মন্ত্রী বললেন।

ইন্দ্রপাল তখন সহজ সরল ভাবে বললেন, "রাজকুমারী, আমি জোরে জোরে অন্য নাম উচ্চারণ করলেও কাগজে কিন্তু শুধু তোমারই নাম লিখেছিলাম। সেই জন্যই তো তোমার বাবা একটা কাগজ তোলার সাথে সাথে অন্য কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলাম।"

সুখলতা অবাক হয়ে বলল, "বাবা টের পেলে আপনাকে আস্ত রাখতেন না।"

"তোমার জন্য এত বড় ঝুঁকি না নিলে তুমি নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে পারতে না।" হাসতে হাসতে জাদুকর ইন্দ্রপাল বলল।

কাঁঠালের আঠা

একবার এক কাবুলিওয়ালা বাংলা দেশে এল। একটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বড় ফল দেখে বলল, "আমি অনেক ধরণের ফল খেয়েছি। দেখেছি। কিন্তু এতবড় একখানা ফল কোনদিন দেখিনি। এটা কি ফল ?"

"এটা কাঁঠাল। খুব ভাল খেতে।" দোকানদার বলল।

কাবুলিওয়ালা ওটাকে কিনে নিল। ঘরে বসে দাঁত দিয়ে ওটাকে কামড়ে অনেক কায়দা কানুন করে খেল। কাঁঠালের স্বাদ ও গন্ধ তাব ভাল লাগল। কিন্তু কাঁঠালের আঠা তার দাড়ি আর গোঁফে জড়িয়ে গেল। জল দিয়ে ধুলো তাতেও আঠা ছাড়ানো গেল না। ছাই দিয়ে ঘষে দেখল তাতে হিতে বিপরীত হল। তখন সে ভেবে পেল না কি করে এই ফল এখানকার লোকে খায়।

শেষে এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা এইভাবে জড়িয়ে গেছে, এ কি করে ছাড়ানো যায় বলুন তো।"

বৃদ্ধ বলল, "আগে হাতে আর দাড়িতে তেল লাগিয়ে কাঁঠাল খাওয়া উচিত ছিল। এখন যা অবস্থা হয়েছে দাড়ির, কামানো ছাড়া কোন উপায় নেই।" কাবুলিওয়ালা নিরুপায় হয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল। তারপর থেকে সে দাড়ি কামানো লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করত, "আপনি কাঁঠাল খেয়েছিলেন বুঝি ?"

ভালমন্দ

কোন এক দেশে সুমন্ত নামে একজন লোক ছিল। লোকের অপকার সে করত না কোনদিন। সুযোগ পেলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উপকার করত। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে কুটির বানিয়ে সে বাস করত। যে কোন সময় কোন অতিথি এলে সানন্দে তাদের আপ্যায়ন করত।

একদিন এক চোর শিলাবৃষ্টিতে আহত হয়ে তার বাড়ির সামনে পড়ে গেল। সুমন্ত চোরকে অচৈতন্য ও আহত অবস্থায় তার বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখে তাকে তুলে এনে সুস্থ করে তুলল।

লোকটার জ্ঞান হওয়ার পর জানাল যে তার খিদে পেয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুমন্ত তাকে খাবার এনে দিল। চোরের হাঁকপাঁক করে খাওয়া দেখে সে ভাবল লোকটা কোথা থেকে এত ক্ষুধা নিয়ে আসছে? কোথায় যাচ্ছে? এসব প্রশ্ন তার মনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। সুমন্ত তাকে প্রশ্ন করতে যাবে এমন সময় চোর সুমন্তকে বলল, "বাবু, এই পড়ন্ত বেলায় এত তাড়াতাড়ি এত ভাল ভাল খাবার কি করে যোগাড় করতে পারলেন?"

সুমন্ত বলল, "আমার কাছে একটা বিচিত্র বাটি আছে। ঐ বাটির কাছে যে ধরণের খাবার চাই সেই ধরণের খাবারই পাই। যখন চাই তখনই পাই।"

চোর সুমন্তর কথা শুনে চোখ ছানা-বড়া করে তাকে জিজ্ঞেস করল, "ঐ বাটিটা আমাকে একবার দেখাবেন? কি ভাবে তার কাছে চাইলে চাওয়া মাত্র পাওয়া যায় দেখাবেন?"

পুলক দাস

সুমন্ত ঘরের ভিতর থেকে ঐ বাটি এনে মেঝেতে উপুর করে সুমন্ত বলল, "পাকা কলা চাই।" তারপর বাটি উল্টে দেখে পাকা কলা আছে !

কাণ্ড দেখে চোর তো অবাক। চোর সেই রাত্রেই সুমন্তের ঐ বাটি চুরি করল।

কিন্তু পরদিন চোর ঐ বাটিকে যা বলে যা চায় কোন কিছুতেই কিছু হয় না। এমন কি তার নিজের খাবারও সেদিন চোর ঐ বাটির কাছে চেয়ে পেল না।

পরের দিন চোর ঐ বাটিটাকে সুমন্তের কাছে এনে বলল, "বাবু, ভুলে আপনার বাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। দয়া করে আপনার বাটি নিয়ে নিন। সুমন্ত বাটি নিয়ে তার চোখের সামনে পায়েস প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য বাটির কাছে চেয়ে চোরকে খাওয়াল।

চোর আর চেপে রাখতে পারল না মনের কথা। সে বলল, "বাবু, এই বাটির কাছে আপনি যা চাইছেন তাই দিচ্ছে কিন্তু আমি চেষ্টা করে এই বাটির কাছ থেকে কিছুই পাইনি। কেন বলুন তো ?"

সুমন্ত বলল, "আমি বেঁচে থাকতে এই বাটির কাছ থেকে কেউ কিছুই পাবে না।"

একদিন চোর বিষ মাখানো খাবার এনে সুমন্তকে বলল, "বাবু, আপনার বাড়িতে আমি দুদিন ভাল ভাল খাবার খেয়ে গেছি। আমি আজ আপনার জন্য সামান্য খাবার এনেছি। আপনি দয়া করে এই খাবার

খেয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করুন। বলে চোর তার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

সুমন্ত কোন রকম সঙ্কোচ না করে তার সামনেই ঐ খাবার খেয়ে নিল। পরক্ষণেই চোর সেখান থেকে চলে গেল।

সেইদিন রাত্রে চোর আবার সুমন্তের বাড়িতে ঢুকল। সুমন্ত বিছানায় ছিল। বাটি খোঁজার সময় কি যেন পায়ে লাগায় চোর পড়ে গেল। শব্দে সুমন্তের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে বলল, "কে! কে ওখানে?"

চোর অবাক হয়ে বলে ফেলল, "আজ্ঞে আপনি বেঁচে আছেন!"

"কেন? বেঁচে থাকব না কেন? কি হল?" সুমন্ত বলল।

"আজ্ঞে আপনাকে যে বিষ মাখানো খাবার দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি মারা গেছেন।" চোর বলল।

"আমি যোগ সাধনা করে থাকি। ফলে বিষক্রিয়া আমার মধ্যে হতে পারে না। সেইজন্যই হয়ত আমি মরিনি।" সুমন্ত বলল।

"আপনার মারা যাওয়ার পর ঐ বাটি নিয়ে বড়লোক হবো ভেবেই আপনাকে বিষ মাখানো খাবার দিয়েছিলাম।" বলল চোর অত্যন্ত নিরুৎসাহিত হয়ে।

"সত্যি আমি দুঃখিত। যাক এখন কিছু খেয়ে গেলে হত না?" সুমন্ত বলল।

একথা শুনে চোর ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলল, "বাবু, আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেও আপনি কিন্তু আমাকে ঘৃণা করছেন না। এটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। উপরন্তু আমাকে আপনজনের মত কাছে টানছেন। এ কি করে সম্ভব।

"কেন সম্ভব হবে না। লোকের ভাল করা আমার অভ্যাস। মন্দ করা তোমার অভ্যাস। তুমি তোমার অভ্যাস না ছাড়লে আমিই বা আমার অভ্যাস ছাড়ব কি করে?" বলল সুমন্ত হাসতে হাসতে।
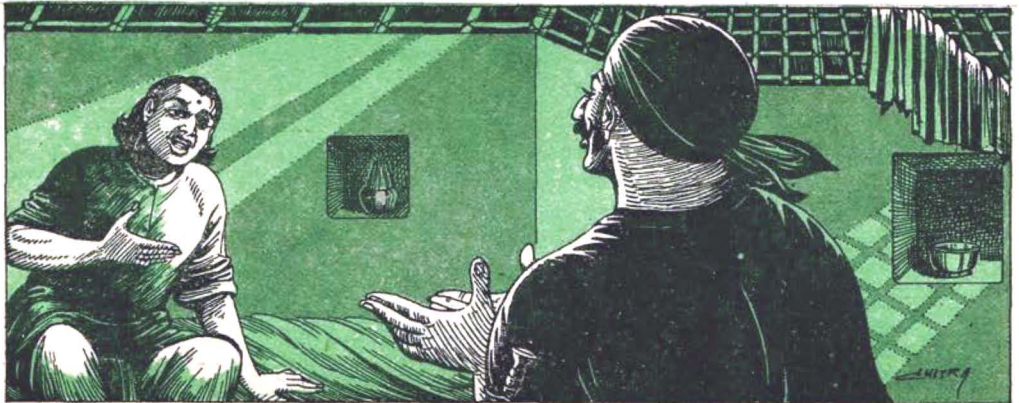
খিদের জ্বালা

অনেকদিন আগে এক রাজা শিকার করতে করতে পথ ভুলে অরণ্যের গভীরে চলে গেল। রাজার সঙ্গে ছিল রন্ধনকারীও। দুজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। পথ খুঁজতে খুঁজতে এক অজ পাড়াগাঁয়ে ঢুকে এক দরজায় টোকা মারল।

ঐ ঘরের লোককে জানাল যে তারা ক্ষুধার্ত। তখন ঐ ঘরের লোক খুদ সেদ্ধ করে ঘাস বেটে চাটনি বানিয়ে দিল। রাজা ঐ খুদের ভাত আর ঘাসের চাটনি চেটে পুটে খেয়ে ঐ ঘরের বুড়িকে নিজের গলার রত্নহার উপহার দিল

রন্ধনকারী ভাবল, কত ভাল ভাল জিনিস রান্না করে কোন উপহার পাওয়া যায় না, অথচ খুদ আর ঘাসের চাটনি খেয়ে রাজা কিনা রত্নহার উপহার দিলেন! প্রাসাদে ফিরে রন্ধনকারী ঘাসের চাটনি বানিয়ে রাজাকে পরিবেশন করে ভাবল রাজা তাকেও একটা রত্নহার দেবে। ঘাসের চাটনি মুখে দিয়েই রাজা তেলেবেগুনে চটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ঐ রন্ধনকারীকে দূর করে দিল।
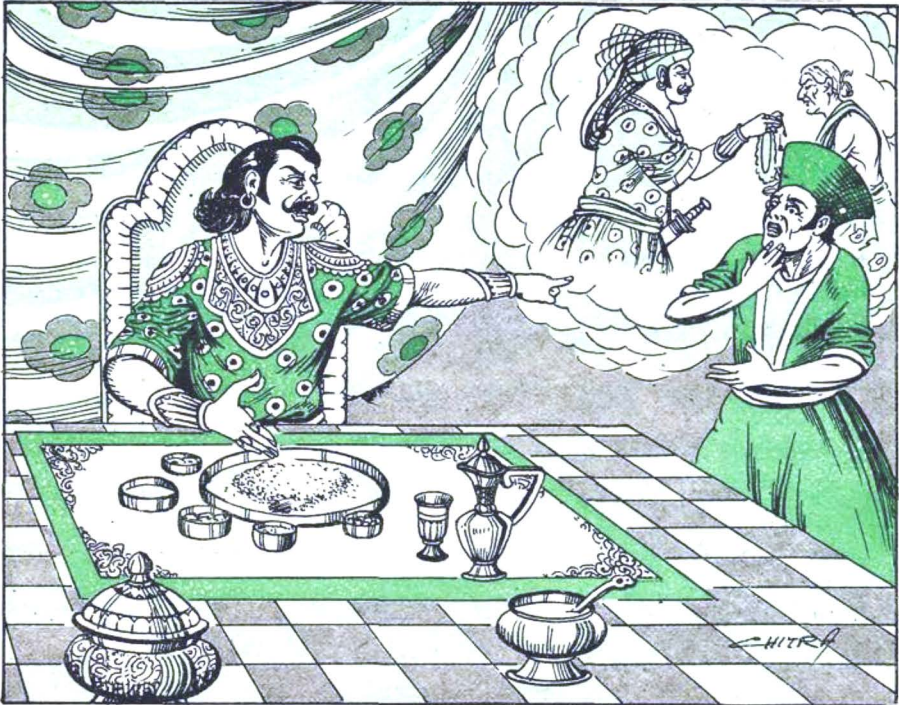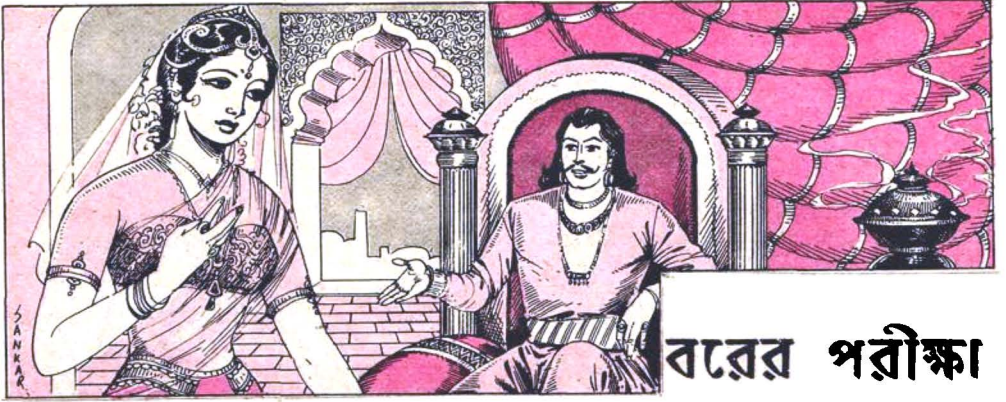
বরের পরীক্ষা

প্রাচীনকালে দেবদত্ত নামে এক রাজা রাজ্য শাসন করতেন। চন্দ্রমতী নামে তাঁর ছিল একমাত্র কন্যা। চন্দ্রমতী রাজমহলের বাইরে কোন দিন আসত না। কি করে জানি প্রচার হয়ে গেল চন্দ্রমতী অত্যন্ত রূপবতী এবং তার হাতের ছোঁয়া লাগলে সমস্ত রোগ সেরে ওঠে। এসব কথা লোকের মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল।

চন্দ্রমতীর বিয়ের বয়স হল। রাজা দেবদত্ত কন্যার বিয়ের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। তখন চন্দ্রমতী বাবাকে বলল, "আপনি আমাকে বিয়ে করার যোগ্য কিছু লোককে বাছাই করতে পারেন। তবে আমার বর বাছাই করার চূড়ান্ত ভার আমার উপরেই ছেড়ে দিন।"

রাজা চারদিকে লোক পাঠিয়ে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে চারজন রাজকুমারকে বাছাই করলেন। এই চারজন রাজকুমার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হল। এদের নাম জয়, অজয়, বিজয় ও বিনয়। রাজা তাদের রাজোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে খাইয়ে দাইয়ে পরে এক পরিচারিকাকে বলল, "চণ্ডী, চন্দ্রমতীকে ডেকে আনতো এখানে।"

চণ্ডী কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, "রাজকুমারী এখন পূজা করছেন মন্দিরে বসে। যতক্ষণ না পূর্ণিমা শেষ হয় ততক্ষণ তিনি নাকি পূজা করবেন। পূর্ণিমা শেষ না হলে নাকি মন্দির থেকে বেরোবেন না।

দেবদত্ত অন্য কোন উপায় না দেখে রাজকুমারদের বললেন, "তোমরা দু-চারদিন অপেক্ষা কর। তোমাদের কোন কিছুর

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

অসুবিধা হবে না। যখন যা দরকার হবে চাইবে। এই চণ্ডী তোমাদের সব রকম চাহিদা মেটানোর জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকবে। একটু হয়ত কষ্ট হবে। তবে আশাকরি তোমরা রাজী হবে।"

রাজকুমাররা রাজা দেবদত্তের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। রাজমহলে এক একটা ঘরে এক এক রাজকুমারের থাকার ব্যবস্থা হল। চণ্ডী প্রত্যেক রাজকুমারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল তাদের কি কি দরকার।

রাজকুমার জয় চন্দ্রমতীকে রূপবতী শুনেই ছুটে এসেছিল বিয়ে করতে। চন্দ্র-মতীকে একবার দেখার জন্য জয়ের মন অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল। তার কাছে এই চার দিনের অপেক্ষা মনে হচ্ছিল যেন চার যুগ। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো তার কাছে দীর্ঘতর লাগছিল।

প্রথম দিন চণ্ডী যখন ফুল দিয়ে তার ঘর সাজাচ্ছিল তখন জয় তাকে বলল, "চণ্ডী, একটু রাজকুমারীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তুমি একটু ব্যবস্থা করবে ?"

চণ্ডী একটু ভয় পাওয়ার অভিনয় করে বলল, "দেখার যদি ভীষণ ইচ্ছে জেগে থাকে তবে দেখাতে পারি। আসুন আমার সঙ্গে। তবে একথা কাউকে বলবেন না।" বলে আলো-আঁধারী পথ ধরে চণ্ডী এগোতে লাগল। জয় তাকে অনুসরণ করল।
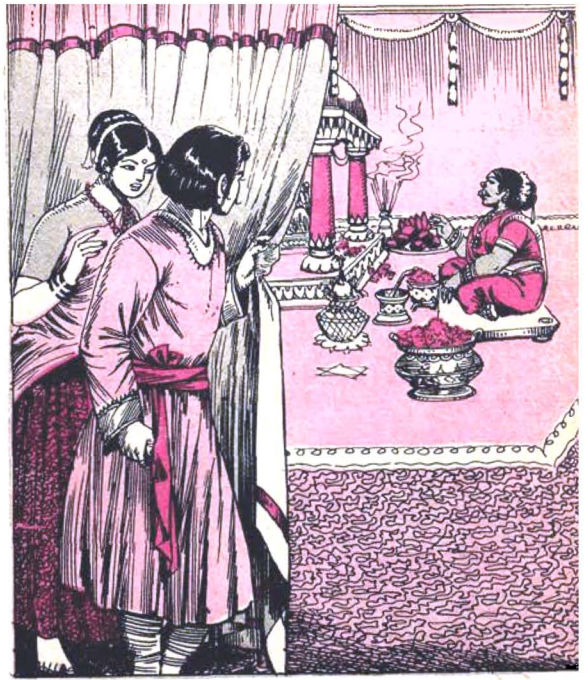
শেষে পূজোর ঘরের কাছে এসে রেশমী পর্দা সরালো চণ্ডী। জয় তার পিছন পিছন গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। তারপর উঁকি মেরে রাজকুমারীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। পার্বতী দেবীর সামনে বসে যে পূজো করছে সে যেমন কালো তেমনি মোটা। তার বড় বড় দাঁত বেরিয়ে আছে। ভয়ঙ্কর এক বিকৃত চেহারার যুবতী বসে আছে সেখানে।

"ছি ছি ! একে বিয়ে করার জন্য আমি এত দূর থেকে এসেছি।" একথা ভেবে সে সেদিনই ফিরে যেতে চাইল। চণ্ডী কি যেন বলতে চাইছিল কিন্তু জয় তার কথায় কান দিল না। সোজা ফিরে গেল।

পরের দিন চণ্ডী অজয়ের বিছানা ঠিক করে দিচ্ছিল। তখন অজয় চণ্ডীকে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, জয় আমাকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে গেল?"

চণ্ডী বলল, "জয় আমাকে গোপনে রাজকুমারীকে দেখাতে বললেন। আমি মূর্খের মত আড়াল থেকে রাজকুমারীকে দেখালাম। রাজকুমারীকে দেখে জয়ের ভাল লাগল না। তাই উনি চটে গিয়ে ফিরে গেছেন।"

অজয় কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "রাজকুমারী রূপবতী হোক নাহোক ওটাই বড় কথা নয়। জয়ের মনে রাখা উচিত ছিল যে সে রাজকুমারীর সঙ্গে রাজ্যও পাচ্ছে। খুবই বোকামী করেছে জয়।"

রাজ্যের লোভে অজয় বিয়ে করতে চায় শুনে চণ্ডী বলল, "আপনি কি ভেবেছেন যে রাজকুমারীকে বিয়ে করবে তাকে রাজত্ব দেওয়া হবে? না তা হবার নয়। রাজা অনেক আগে থেকেই ভাইপোকে ঠিক করে রেখেছেন রাজা করবেন। ভাইপোকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"

একথা শুনে অজয় নিরাশ হয়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়া ঠিক করে বলল, "তাহলে আমার আর এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না। আমি চলে যাচ্ছি।"

পরদিন চণ্ডী উদ্যানে ফুল তুলছিল। তখন বিজয় তার কাছে গিয়ে বলল, "কাল তোমাকে দেখতে পাইনি। কোথায় ছিলে?"

চণ্ডী বিজয়কে জয় ও অজয়ের ব্যাপার সব জানাল।

বিজয় একথা শুনে হেসে বলল, "ওরা কি বোকা। আরে নাই বা রইল রূপ। নাই বা পেলাম রাজত্ব। আমার আগ্রহ অন্য ব্যাপারে। শুনেছি রাজকুমারীর ছোঁয়া লাগলে যে কোন রোগ সেরে যায়। আমার বাবা মা বহু বছর ধরে রোগে ভুগছেন। আমার ইচ্ছা রাজকুমারীকে বিয়ে করে বাবা মার রোগ সারানো। এই আশা নিয়েই আমি অপেক্ষা করছি।"

চণ্ডী অবাক হয়ে বলল, "মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগলে রোগ সারে এই ঢাহা মিথ্যা

কথা আপনাকে কে বলল ? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার অদ্ভুত বিশ্বাস দেখে।"

বিজয় নিরাশ হয়ে বলল, "ভালই হোল জানতে পারলাম। একথা আগে জানতে পারলে কে মাড়াত এই পথ!" সেই রাত্রেই চলে গেল বিজয় নিজের রাজ্যে।

সেদিন রাত্রে চণ্ডী বিনয়ের ঘরে ঢুকে তাকে কোন এক যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে বলল, "কি হয়েছে আপনার ?"

"চণ্ডী আমি হয়ত আর বেশিক্ষণ বাঁচবো না। হঠাৎ বুকে ব্যথা উঠেছে। কেন জানি না। কোন দিন এই ধরণের ব্যথা ওঠেনি।" একথা বলে বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগল বিনয়।

চণ্ডী তৎক্ষণাৎ বৈদ্য ডেকে তাকে ওষুধ দিতে বলল। বৈদ্য যে ওষুধ দিল তা সে বিনয়ের বুকে আস্তে আস্তে রগড়াতে লাগল। বিনয় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলে বিনয় চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখল তার মাথার কাছে বসে চণ্ডী পাখা হাতে বাতাস করছে।

বিনয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "চণ্ডী, তুমি সারারাত আমার মাথার কাছে বসে কাটালে! আমার বুকের ব্যথা কেন উঠল জানি না। তবে ব্যথা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ তা সেরেও গেল। তুমি না থাকলে তা সারত না।

তুমি তাড়াতাড়ি বৈদ্য না ডাকলে যে ব্যথা উঠেছিল আমি হয়ত কখন মরে যেতাম। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি নতুন জীবন পেয়েছি। শোন চণ্ডী, আমি রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসেছিলাম বটে তবে এখন সে চিন্তা ত্যাগ করেছি। আমি রাজকুমারী ও রাজত্ব চাই না। আমি এমন এক কুমারীকে বিয়ে করতে চাই যে আমার দুঃখের দিনে আমার পাশে থাকবে। আমার ব্যথা যে বুঝবে, নিজের ব্যথা মনে করবে তাকেই আমি বিয়ে করতে চাই। তাই বলছি চণ্ডী তুমি আমার সঙ্গে আমার দেশে চল। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

একথা শুরে চণ্ডী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলল, "আমিও আপনাকে বিয়ে করতে রাজী আছি। আমিও আপনার মত যোগ্য পতি খুঁজছিলাম। শুনুন, আমার নাম চণ্ডী নয়, আমারই নাম চন্দ্রমতী।"

বিনয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেকি ? তুমিই রাজকুমারী চন্দ্রমতী !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আপনাদের চারজনের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। ওরা তিনজন আমাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আসেনি। কেউ এসেছে আমার রূপের জন্য, কেউ এসেছে আমার রাজত্বের লোভে, আবার আর একজন এসেছে আমার ছোঁয়া দিয়ে নিজের বাবা-মার রোগ সারাতে। একমাত্র আপনি আমাকে চেয়েছেন। তাই আপনাকেই আমারও পছন্দ।" চন্দ্রমতী মনের কথা বলল।

তখন বিনয় বুঝতে পারল যে রাজকুমারীর হাতের ছোঁয়া পেয়েই তার ঐ ব্যথা সেরে গেছে। রাজকুমারী চন্দ্রমতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যেন ভাষা নেই—এমন ভাব ফুটে উঠল বিনয়ের চোখে মুখে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিনয়ের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল মহা ধুমধামের সঙ্গে।

মহাভারত

পাণ্ডবদের সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য শুনে সঞ্জয় বললেন, "হে রাজন, পাণ্ডবদের মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানা নেই। ওরা যুদ্ধে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে মাত্র। ওদের সৎব্যবহারই অন্যতম কারণ। আপনার পুত্রদের অপরাধই বিষবৃক্ষের কাজ করে তাদের নাশ করছে। কত লোক তো আপনাকে হিতের কথা শুনিয়েছেন। আপনি কি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেছেন? করেন নি। বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ আর আমিও কত বুঝিয়েছি আপনাকে। কিন্তু আপনি আমাদের কথায় কান দিলেন না। আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করছেন, ঠিক এই প্রশ্নই দুর্যোধন ভীষ্মকে করেছিলেন।"

তারপর দুর্যোধন ভীষ্মকে রাত্রে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সঞ্জয় তা বললেন।

চতুর্থ দিনের রাত্রে দুর্যোধন ভীষ্মকে খুব কোমল স্বরে বললেন, "পিতামহ, আপনি থাকতে; আপনার সঙ্গে দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত প্রমুখ মহারথী থাকতে কি করে এভাবে আমাদের পরাজয় ঘটছে পিতামহ? আপনারা তো এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য জীবন পণ করেছেন। তবু কেন পাণ্ডবদের জয় হচ্ছে পিতামহ!"

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ভীষ্ম বললেন, "দুর্যোধন, তোমাকে আগেও আমি বহুবার বলেছি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তোমার উচিত নয়। তোমাকে পাণ্ডবদের

সঙ্গে সন্ধি করার উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার কথা শোন নি। পাণ্ডবদের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব ছিল। এখন বুঝতে পারছ ওদের অবজ্ঞা করা তোমার ভুল হয়েছে? কৃষ্ণ যাঁদের পক্ষে থাকেন তাঁদের পরাজিত করা যায় না। কৃষ্ণ যাঁদের রক্ষা করেন তাঁদের অতীতেও কেউ মারতে পারেনি, বর্তমানেও পারবে না, ভবিষ্যতেও না। আমি তো করেছি এমন কি বেদজ্ঞ পণ্ডিতরাও বহু-বার বারণ করেছেন। কিন্তু তুমি মোহগ্রস্ত হয়েছ। যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছ।"

তারপর বিশ্ব-উপাখ্যান শোনালেন একবার ব্রহ্মদেব গন্ধমাদন পর্বতে বসে-ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেবতা ও ঋষিগণ তাঁর চারপাশে দাঁড়ালেন। সেই সময় আকাশে এক রথ দেখা দিল। ব্রহ্মা ঐ রথের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করলেন। এ দৃশ্য দেখে দেবতা ও ঋষিগণও প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা ঐ রথের স্তুতি গেয়ে বললেন, "হে দেব, আপনি আপনার অংশ পাঠিয়ে যদুবংশে এমন একজনের জন্ম দিন, যার ফলে জগৎ সংসারের কল্যাণ হবে।"

"তোমার প্রার্থনা শুনেছি। তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।" উপর থেকে এই ধ্বনি শোনা গেল। পরমুহূর্তে ঐ রথ অন্তর্ধান হলো।

তখন দেবতা ও ঋষিগণ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করলেন, "পিতামহ, আপনি এখন কার কাছে প্রার্থনা করলেন? এবং কেন করলেন?"

এ কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, "আমি মহাবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছি। প্রাচীন কালে যে দৈত্য দানব মারা গিয়েছিল, ওরা আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। ওদের বধ করার জন্য নরের সঙ্গে নারায়ণেরও জন্মগ্রহণ করা উচিত। সাথে সাথে দেবতারও জন্ম হবে। এই নবজাতকদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তবে এ কথা মূর্খেরা বুঝতে পারবে না।"

ভীষ্ম এই কাহিনী শুনিয়ে দুর্যোধনকে বললেন, "তুমিও এক রাক্ষস বিশেষ! সেই জন্যই কৃষ্ণ এবং অর্জুনের বিরুদ্ধে পায়ে পা বাধিয়ে যুদ্ধ করতে এগিয়েছ।"

তারপর সবাই যে যার শিবিরে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ভীষ্ম রচনা করলেন মকর ব্যূহ আর পাণ্ডবরা তৈরি করলেন শ্যেন ব্যূহ। পাণ্ডবদের ব্যূহের সামনের সারিতে ছিলেন ভীম, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। তার পরের সারিতে ছিলেন সাত্যকি ও অর্জুন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আগের দিন কৌরব পক্ষের বহু সৈন্য মারা গিয়েছিল। সে কথা মনে রেখে এবং ভাইদের মৃত্যুবরণের কথা স্মরণ করে দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, "হে আচার্য, আপনার চেয়ে আমার হিত-কামী আর কেউ নেই। আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের সাহায্যে আমরা দেবতা-দেরও পরাজিত করতে পারি। পাণ্ডবরা তো কোন ছার। আজ আপনি এমন এক যুদ্ধ করুন যাতে আজকের যুদ্ধেই পাণ্ডবরা শেষ হয়ে যায়।"

দ্রোণ রেগে গিয়ে দুর্যোধনকে বললেন, "তুমি নিতান্তই নির্বোধ। তা না হলে কি আর পাণ্ডবদের ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান

থাকত না তোমার! আমি নিশ্চিত যে তাদের জয় করা সম্ভব নয়। যাই হোক, তুমি যখন বলছ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

তারপর দ্রোণ সাত্যকীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। তৎক্ষণাৎ সাত্যকিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন ভীম। আর দ্রোণকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন ভীষ্ম এবং শল্য। ভীষ্ম ও দ্রোণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কৌশল দেখে অভিমন্যু, উপপাণ্ডব ও শিখণ্ডী পৌঁছে গেলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর সাথে যুদ্ধ করলেন না। দ্রোণ তীব্র গতিতে শিখণ্ডীকে আক্রমণ করতে গেলেন। মুহূর্তে শিখণ্ডী সরে

খড়্গ ও ঢাল নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। তারপর ভীম সাত্যকিকে নিজের রথে তুলে নিলেন। আর দুর্যোধন ভূরি-শ্রবাকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের রথে তুলে নিলেন! কৌরব ও পাণ্ডবদের এই পঞ্চম দিনের যুদ্ধে শুধু অর্জুনের শরাঘাতে কৌরব পক্ষের পঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হলেন। তারপর সূর্যাস্ত হলো। সেই আবছা অন্ধকারে ভীষ্ম অবহার ঘোষণা করলেন।

ষষ্ঠ দিনের সকাল। সেদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন রচনা করলেন মকর ব্যূহ আর ভীষ্ম রচনা করলেন ক্রৌঞ্চ ব্যূহ। ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে ভীম ও অর্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। তাঁদের শর বর্ষণের ফলে অসংখ্য সৈন্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে গেল। দ্রোণ ভীমকে ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করলেন। ভীম ভীষণ রেগে গিয়ে দ্রোণের সারথিকে মেরে ফেললেন। দ্রোণ সারথির আহত হওয়ার পর নিজেই রথ চালিয়ে পাণ্ডবদের সেনা বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। এই অবস্থার জন্য পাণ্ডব সেনারা প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা ছড়িয়ে গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

পর মুহূর্তেই ভীম ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে কৌরব সেনার মধ্যে

গেলেন। এইভাবে ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুন, দুর্যোধনের সঙ্গে ভীম, শল্যের সঙ্গে যুধিষ্ঠির এবং দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সঙ্গে সাত্যকি ও দ্রুপদ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে ছিন্ন নরমুণ্ড পরার এমন শব্দ হতে লাগল যেন আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। সাত্যকির দশ পুত্র ভূরিশ্রবাকে ঘিরে বাণ বর্ষণ কবতে লাগলেন। ভূরিশ্রবা ভল্লের আঘাতে দশজনেরই শিরচ্ছেদন করলেন।

পুত্রদের নিহত হতে দেখে সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দুজনেরই রথ ও অশ্ব নষ্ট হল। তখন দুজনেই

ঢুকে পড়লেন। ভীমের গদার আঘাতে বহু কৌরব সেনা নিহত হলো।

দূর থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নের মনে হল ভীম বিপদে পড়তে পারেন। তিনি তাড়াতাড়ি ভীমের দিকে এগিয়ে এলেন। কিছুদূর এগোতেই দেখতে পেলেন ভীমকে ঘিরে ফেলার জন্য চারদিক থেকে কৌরব সেনারা জড় হচ্ছে। পরক্ষণেই ভীমের উপর চার-দিক থেকে তীর বর্ষিত হতে লাগল। ভীমের গোটা শরীর থেকে রক্তের ধারা বইতে লাগল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমকে নিজের রথে বসালেন। তাড়াতাড়ি তাঁর দেহে বিদ্ধ তীরগুলো তুলে তাঁকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে একসঙ্গে বধ করার উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা এগিয়ে আসতে লাগল। অজস্র তীর বর্ষিত হতে লাগল। তাতেও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিচলিত না হয়ে সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষকে অজ্ঞান করে দিলেন। তখন দ্রোণ তাড়াতাড়ি সেখানে এসে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার অস্ত্র প্রয়োগ করে সবার জ্ঞান ফেরালেন।

অনেকক্ষণ ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে না দেখতে পেয়ে যুধিষ্ঠির ঘাবড়ে গেলেন। তিনি অভিমন্যু প্রমুখ বারজন যোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিলেন। ওদের দেখতে পেয়ে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে

যুদ্ধ করতে লাগলেন। আর ঠিক তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখতে পেলেন তাঁর পিতা দ্রুপদ দ্রোণের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় পালাচ্ছেন। তখন তিনি নিজের রথ ও সারথিকে খুইয়ে দ্রুত গিয়ে উঠলেন অভিমন্যুর রথে। প্রবল বিক্রমে দ্রোণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। তার যুদ্ধ কৌশল ও তীব্রতা দেখে উভয় পক্ষের সেনারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

যুধিষ্ঠিরের আদেশ পেয়ে অভিমন্যু, দ্রৌপদীর ছেলেরা ও ধৃষ্টকেতুও সসৈন্যে এসেছিলেন ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করতে। সূচীমুখ ব্যূহ রচনা করে তারা সহজেই কৌরব সেনাদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। তখন আবার প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দ্রোণ ও দুর্যোধন প্রমুখের বিরুদ্ধে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবল যুদ্ধ হল।

অপরাহ্ন সমাগত। সূর্যের রঙ লাল। ভীম দুর্যোধনকে বললেন, "বহু বছর পরে আজ সেই আকাঙ্খিত মুহূর্ত এসে গেছে। সেই সময় হয়েছে। আজ আর নিস্তার নেই। এখন যদি যুদ্ধ থেকে সরে না দাঁড়াও তাহলে তোমাকে বধ করে জননী কুন্তী ও দ্রৌপদীর অপরিসীম কষ্টের প্রতিশোধ নেব। আজ তোমাকেই শুধু নয় তোমার বন্ধুদেরও বধ করব। তারপর ভীমের শরের আঘাতে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন হল। তাঁর সারথি নিহত হল। চারটি অশ্ব নিহত হল। আর দুর্যোধন শরবিদ্ধ হয়ে মূর্ছিত হলেন। কৃপাচার্য আহত দুর্যোধনকে নিজের রথে তুলে নিলেন। শরাঘাতে সেই যুদ্ধে দুর্যোধনের চার ভাই বিকর্ণ, দুর্মুখ, জয়ৎসেন ও দুষ্কর্ণ ভূপতিত হলেন। পরক্ষণে দুষ্কর্ণ মারা গেলেন।

সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ হল। পরে অবহার ঘোষিত হলে পাণ্ডব ও কৌরবরা যে যার শিবিরে ফিরে গেলেন।

রক্তাক্ত শরীরে, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দুর্যোধন শিবিরে ফিরে গিয়ে ভীষ্মকে বললেন, "পিতামহ, আমাদের ব্যূহে
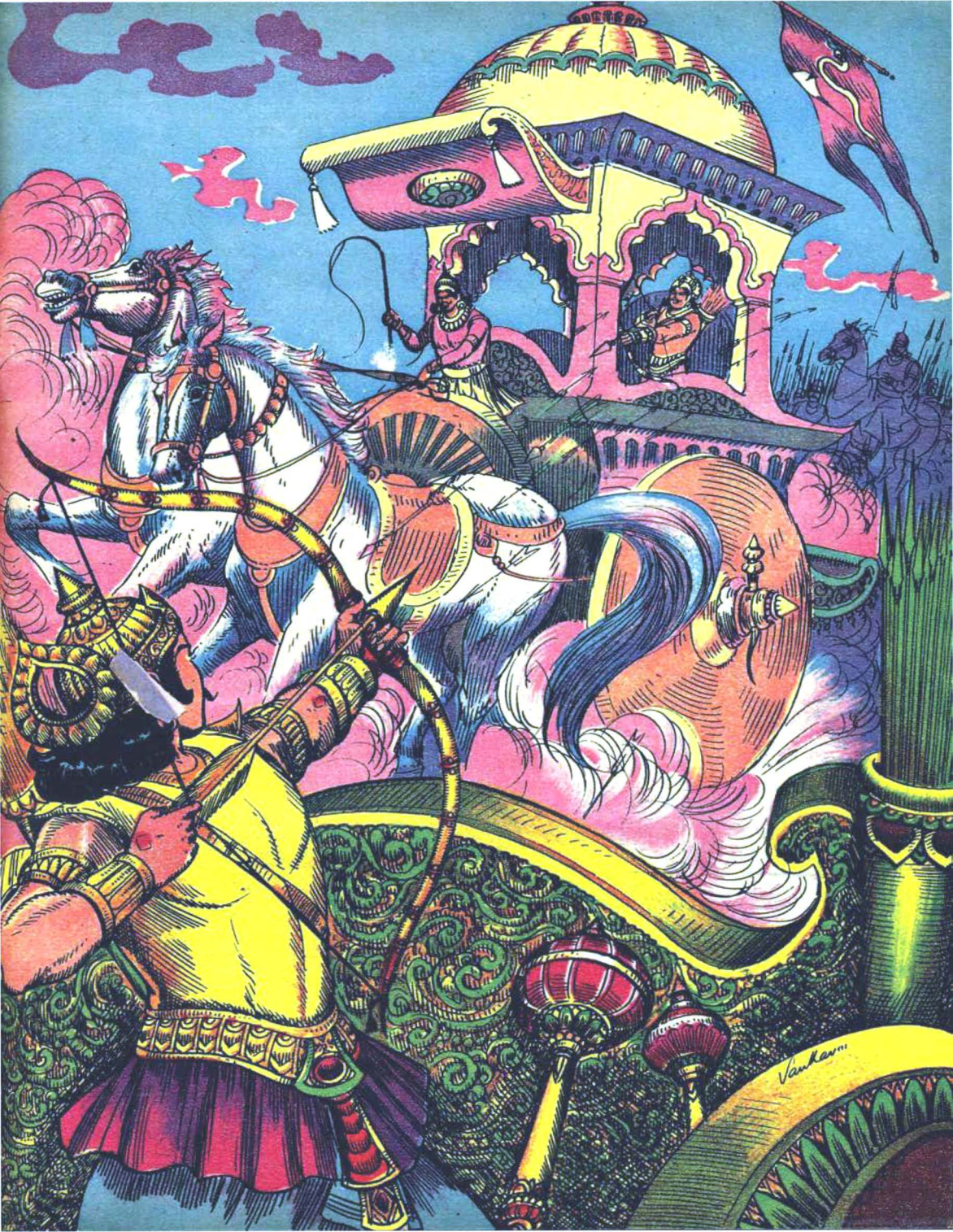
পাণ্ডবরা ঢুকে পড়েছে। তাঁদের আক্রমণে আমাদের সেনারা শয়ে শয়ে মারা গেছে। আমি ভাবতে পারি না কি করে আমাদের মকর ব্যূহে ভীম ঢুকতে পারল। আমার উপর তার সেকি রাগ। তার সেই ভয়ঙ্কর রুদ্ররূপ দেখে আমি জ্ঞান হারিয়েছি। ভীম আমাকে পরাস্ত করেছে এ আমি ভাবতে পারছি না। একথা ভাবতেই ভীষণ অশান্তি হচ্ছে। হে পিতামহ, আপনার আশীর্বাদে আমি যেন পাণ্ডবদের বধ করতে পারি, জয়লাভ করতে পারি।"

ভীষ্ম হেসে বললেন, "রাজপুত্র, আমার অন্য কোন গোপন ইচ্ছা নেই। আমার একমাত্র ইচ্ছা তুমি বিজয়ী হও, তুমি সুখী হও। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি জান রাজপুত্র, পাণ্ডবদের যাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অস্ত্র-বিশারদ। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা ক্রোধের বিষ উদ্গার করছেন। তুমি আগে থেকেই তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে। এখন তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছে। তোমার কোন আশঙ্কার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করবো। নিজের জীবন রক্ষার কোন রকম চেষ্টা করবো না। কিন্তু একটা অসুবিধা কি জান রাজপুত্র, স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁদের সহায় তাঁদের যে দেবতারাও পরাজিত করতে পারেন না। যাই হোক, এই যুদ্ধে হয় আমি তোমার কথা রাখবো, জয়ী হব, না হয় পরাজিত হব। শুধু কি আমি, দ্রোণ, শৈল্য, কৃত-বর্ম, অশ্বত্থামা সৈন্ধব, বৃহৎবল, চিত্রসেন প্রভৃতি আরও হাজার হাজার যোদ্ধা প্রাণ-পণে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু যাকে রাখে কৃষ্ণ তাকে মারে কে!"

এই কথা বলে দুর্যোধনের শরীরের ক্ষতস্থানে ভীষ্ম বিশল্যকরণী ওষধি প্রয়োগ করলেন।
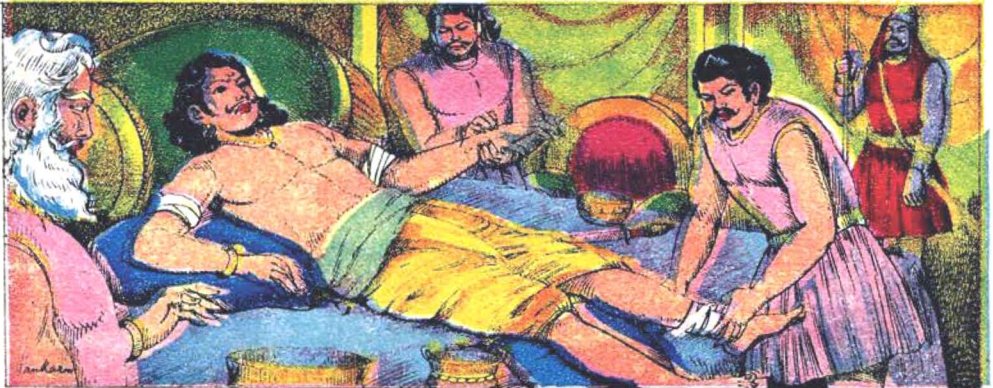
মিত্র-ভেদ

পাঁচ

দমনকের মুখে দণ্ডিলের কাহিনী শুনে সঞ্জীবক বলল, "তোমার কথাই ঠিক। তোমার যেমন ইচ্ছে তেমন কর।"

এরপর দমনক সঞ্জীবককে পিঙ্গলকের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "মহারাজ, এই হোল সঞ্জীবক। আপনার যেমন ইচ্ছে জাগে তেমন করুন।"

সঞ্জীবক পিঙ্গলককে প্রণাম করে সামনে বসে পড়ল অত্যন্ত বিনম্র বদনে।

পিঙ্গলক সদর্পে নিজের বিরাট নখের পাঞ্জা সামনের দিকে ছড়িয়ে বলল, "তোমাকে স্বাগত জানাই। বল কেমন আছ? হঠাৎ এই বনেই বা এলে কেন? কি ব্যাপার?"

সঞ্জীবক জানাল সে কেমন করে বর্দ্ধমানের দলে ছিল, কেমন ভাবে, জঙ্গলে কেমন ভাবে দল ছাড়া হয়ে গেল।

একথা শুনে পিঙ্গলক অভয় দিয়ে বলল, "বন্ধু, কোন রকম ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি এই বনে যেখানে খুশী যেতে পার, যত খুশী যা খুশী খেতে পার। তবে সব সময় আমার চোখের সামনে থাকার চেষ্টা কর। কারণ আমার চোখের আড়ালে থাকলে অনেক হিংস্র জানোয়ার তোমাকে শেষ করে ফেলতে পারে!"

"আজ্ঞে ঠিক আছে।" বলে সঞ্জীবক যমুনার তীরে গিয়ে জল পান করে নির্ভয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

যত দিন যায় পিঙ্গালক ও সঞ্জীবকের মধ্যে বন্ধুত্ব নিবিড়তর হতে থাকে। পিঙ্গলক প্রত্যেক ব্যাপারে সঞ্জীবকের পরামর্শ নেয়। সঞ্জীবক খুব বুদ্ধিমান। সে করটক ও দমনকের খোঁজ খবর গোপনে রাখত এবং পিঙ্গলককে সঠিক পথে চালাত। শেষে এমন অবস্থা হোল যে পিঙ্গলক ঐ দুটো জানোয়ারকে আর কাছে ঘেষতে দিত না। ফলে সঞ্জীবকের জন্যই তাদের পেটে টান পড়ল।

একদিন দমনক করটককে বলল, "ভাই, এতো আচ্ছা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। পিঙ্গলক সঞ্জীবকের পাল্লায় এমনভাবে পড়েছে যে এমন কি শিকার করতে বেরোনোও বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে উপোষ করে কদ্দিন আর কাটানো যায়।"

"এর জন্য তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী। তুমি সোজা পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে সব বিস্তারিত বলে এস। এক ঘাসখেকো জানোয়ারকে একেবারে মাথায় করে এনে রাজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। এখন দুঃখ করে কোন লাভ নেই।" করটক বলল।

"তুমি ঠিক বলেছ। দোষ আমারই। নিজের সামান্য দোষে যে কত বড় ক্ষতি হয় তার প্রমাণ দেবশর্মার কাহিনী থেকেই পরিষ্কার জানতে পারি।" দমনক বলল।

"কি বললে? দেবশর্মার কাহিনী? শোনাও তো সে কাহিনী।" করটক বলল। দমনক কাহিনী শুরু করল ঃ

দেবশর্মার কাহিনী

কোন এক অঞ্চলে জনপদের দূরে এক মঠ ছিল। দেবশর্মা নামে এক যোগী ঐ মঠে থাকত। শিবলিঙ্গের পূজো করত। বহু ভক্ত ঐ মঠে এসে অনেক দামী দামী কাপড় এনে দান করে যেত। সব কিছু ত্যাগ করে মঠে এলেও দেবশর্মার মন থেকে সোনার প্রতি লোভ যায়নি। দেবশর্মা নিজের পোষাক বদলে নগরে নিয়ে গেল ঐ সব দামী দামী কাপড়। সোনার পরিবর্তে সে ঐ দামী দামী কাপড় দিয়ে দিল। আর সোনা পোঁটলা বেঁধে ফিরল

ঐ মঠে। তারপর থেকে তার মনে বিরাট এক পরিবর্তন দেখা দিল। দিন রাত ঐ পোঁটলাটাকে কাঁধে ফেলে রাখত। বড়রা সঠিক ভাবেই বলেছে যে, 'সম্পত্তির সৃষ্টি করা শক্ত। সম্পত্তি রক্ষা করাও কঠিন। আর সেই সম্পত্তি হারালে দুঃখের সীমা থাকে না। সম্পত্তি ব্যায় করতেও দুঃখ লাগে। সম্পত্তির মূলেই আছে দুঃখ।'

আষাড়ভূতি নামে এক দুষ্ট লোক ছিল। সে কোন পাপ কাজ করতেই ভয় পেত না। পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই ছিল তার লক্ষ্য। দেবশর্মা কাঁধে যে সোনা বয়ে বেড়াচ্ছে তা একদিন তার নজরে পড়ল। প্রতি মুহূর্তে তার এক চিন্তা কি করে সে ঐ সোনা হাতাবে। মঠের দেয়ালগুলো পাথর দিয়ে তৈরি ছিল তাই সিঁধ কাটা তার পক্ষে অসাধ্য ছিল। তাই সে ঠিক করল দেবশর্মার শিষ্য হয়ে তার বিশ্বাসী পাত্র হবে।

একথা ভেবে একদিন আষাড়ভূতি দেবশর্মার কাছে গিয়ে বলল, "পরম শিবকে প্রণাম করি।" তার পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আবার সে বলল, "হে মহাত্মা! এই বিশ্ব সংসার শুকনো ঘাসের ছাইয়ের মত ক্ষণস্থায়ী। সুখ সব জলহীন মেঘের মত। বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবই স্বপ্নের মত অলীক। মোক্ষ লাভের পথ খুঁজতে

আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনার সেবাই জীবনের এখন প্রধান কর্তব্য।"

একথা শুনে দেবশর্মা বলল, "বাছা, এই অল্প বয়সে তুমি যে সংসারের এই সব বন্ধন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছ তার জন্য তুমি ধন্য হয়েছ। যৌবনে যে আত্ম নিগ্রহ করতে পারে সেই প্রকৃত সাধক। তুমি আমাকে মোক্ষ লাভের পথ জিজ্ঞেস করছ? 'ওম্ নম শিবায়' বলে যে শিবের মাথায় একটা ফুল চড়াবে সেই মোক্ষ লাভ করবে। তার আর পুনর্জন্মের কোন ভয় নেই।"

শুনে আষাড়ভূতি হঠাৎ দেবশর্মার পা ধরে বলল, "মহাত্মা, কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল চড়াতে হবে শিখিয়ে দিন।"

"শেখাব বাছা, শেখাব। মুস্কিল হল রাত্রে নির্জন অবস্থায় তোমার মঠে ঢোকা নিষেধ। যোগীর কর্তব্য হল সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করা। যোগীকে রাত্রে একা থাকতে হয়। তোমাকে মন্ত্র দেব। মঠে নয়, মঠের বাইরের এক কোণে রাত্রে ঘুমাবে।" দেবশর্মা বুঝিয়ে বলল।

"প্রভু, আপনার আদেশ আমি মাথায় করে রাখছি।" আষাড়ভূতি বলল।

সেই রাত্রেই দেবশর্মা আষাড়ভূতিকে মন্ত্রদান করল। শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করল তাকে। আষাড়ভূতি প্রত্যেকদিন গুরুর পা টেপে। পূজো করার জন্য ফুল পাতা আনত। গুরুকে প্রত্যেক কাজে সাহায্য করত। দিনের পর দিন একই ধরণের কাজ করে যেতে লাগল সে। একদিন ভাবল সে, "কোন দিন কি দেবশর্মা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না! কোন দিন কি আমি সহজভাবে ঐ সোনার পোঁটলা হাতাতে পারব না। শেষে কি একদিন দুপুরে তাকে মেরে ফেলতে হবে! নাকি বিষ খাইয়ে মারতে হবে!"

এমন সময় দেবশর্মার এক শিষ্য এসে তাকে পরের দিন তার পৈতা উপলক্ষ্যে উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ করল।

পরের দিন দেবশর্মা আষাড়ভূতিকে সঙ্গে নিয়ে ঐ শিষ্যের বাড়ি রওনা হল। কিছুদূর যাওয়ার পর পথে এক নদী পড়ল। দেবশর্মা কাপড়ের ভাঁজে ঐ সোনার থলিটাকে গুটিয়ে নিল। প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করার আগে দেবশর্মা কাপড়ের ঐ পোঁটলা আষাড়ভূতির হাতে দিয়ে বলল, "এই বস্ত্র, বিশেষ করে এই পোঁটলা যত্ন করে রাখ। এটা শিবের সম্পত্তি।" একথা বলে দেবশর্মা চলে গেল। নাগালের বাইরে দেবশর্মা যেতেই ঐ পোঁটলা নিয়ে আষাড়ভূতি সেখান থেকে চম্পট দিল। তারপর তার পাত্তা মেলেনি।
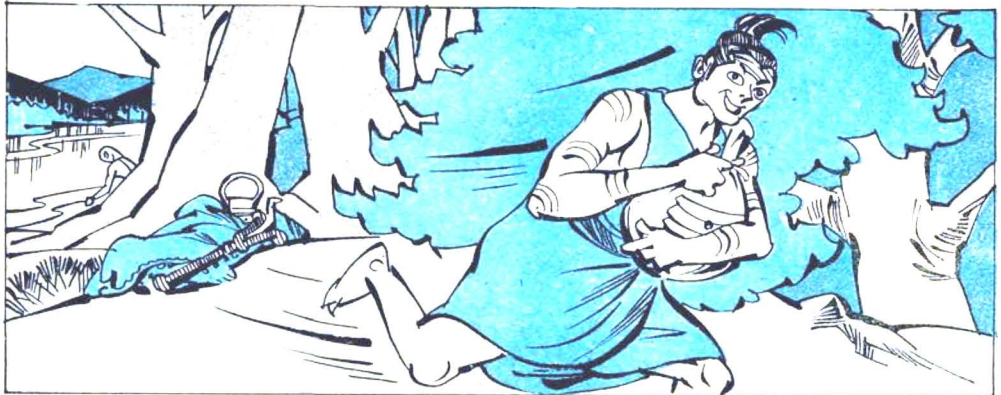
বিষুব রেখায় বরফের পাহাড়

আফ্রিকায়, বিষুব রেখার উপর থাকা সত্ত্বেও, কীন্যা পর্বতের শিখরে বরফ জমে থাকে। এখানকার সবচেয়ে উঁচু শিখরেব উচ্চতা ১৭০৪০ ফুট। এক কালে এটা ছিল অগ্নি পর্বত। এই পাহাড়ে ওঠা খুব কঠিন। কারণ পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য কাঁটার গাছ।

ফটো : অনন্ত দেশাই
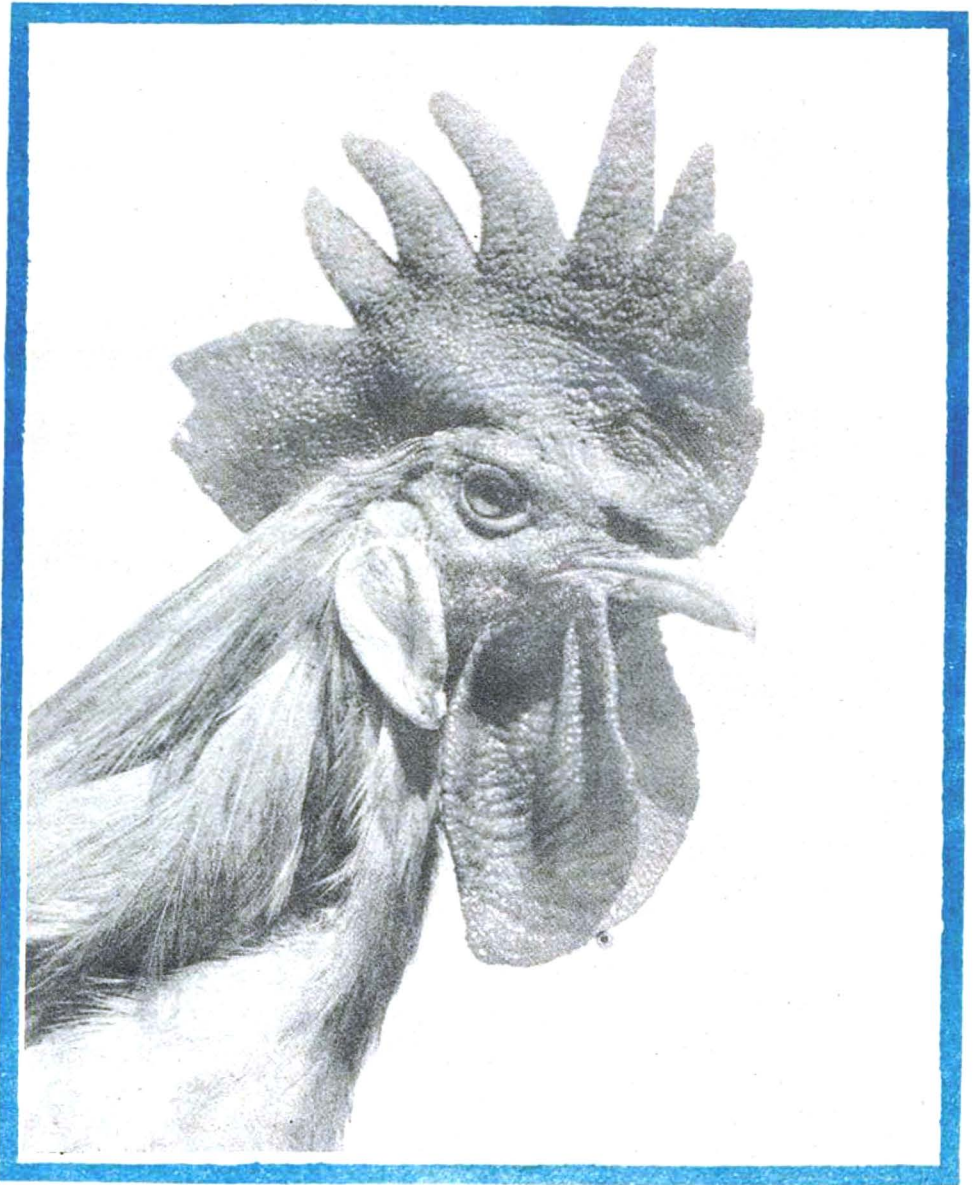
পুরস্কৃত
নাম

তাকিয়ে আছে আপন মনে

পুরস্কার পেলেন
দেবব্রত বিশ্বাস

ফটো : অনন্ত দেশাই
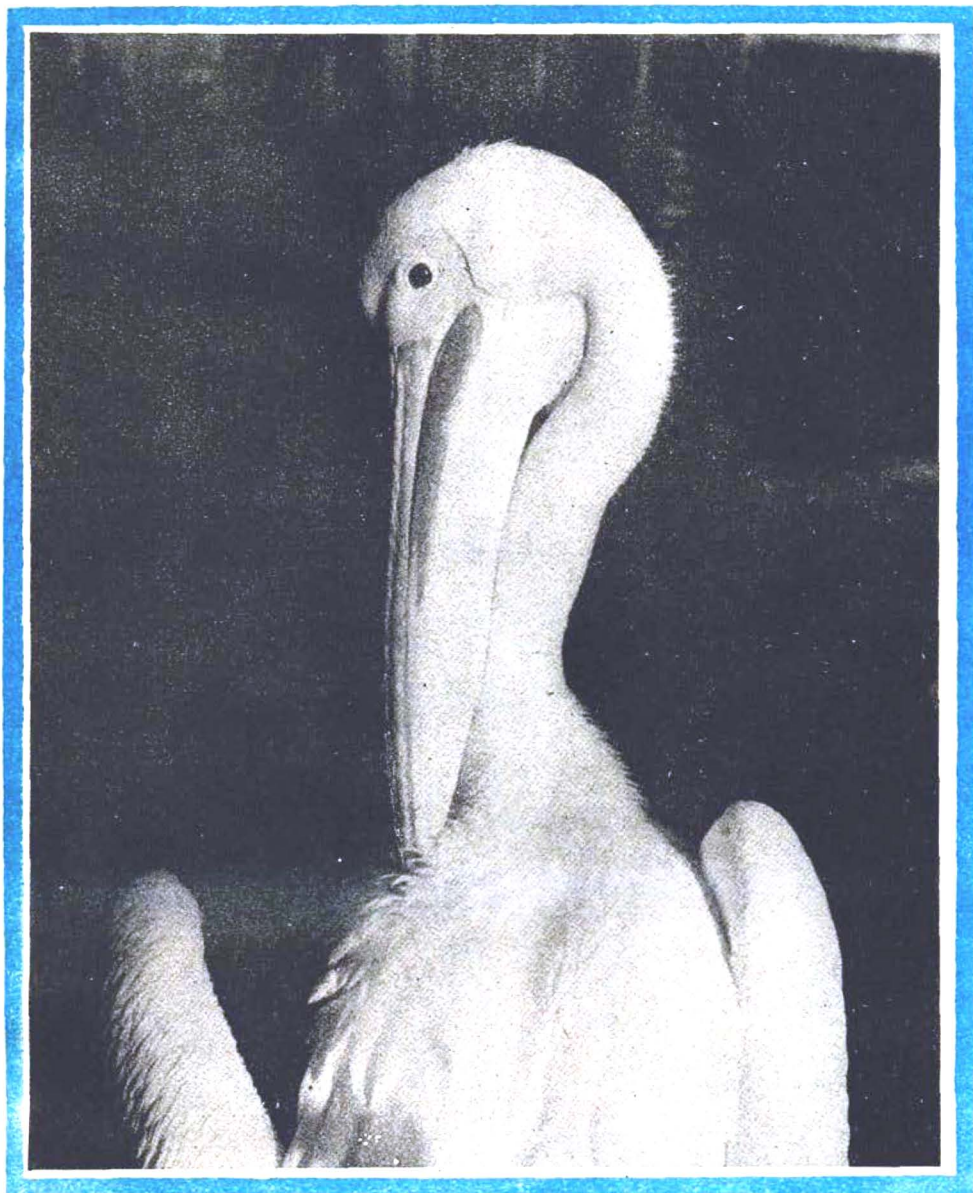
চাবুয়া
ডিব্রুগড়

ভাবছে কিছু সঙ্গোপনে

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★
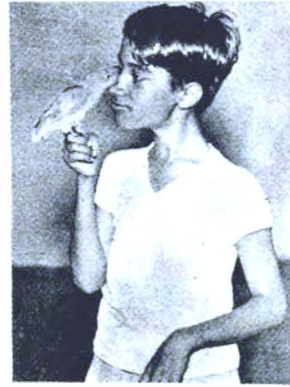
* ফটো-নামকরণ ২০শে জানুয়ারী '৭৪-এর মধ্যে পৌছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো মার্চ '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

শহরের বাইরে

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

শহরের মাঝে

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor : 'CHAKRAPANI'

Photo by: C. K. SATYARAJ

মিত্রভেদ